# যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ

আলতাফ পারভেজ



যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ • আলতাফ পারভেজ

যোগেন মণ্ডল ছিলেন দলিত-তফসিলি সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা। বর্ণহিন্দু প্রভাবাধীন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে সমস্বার্থ বোধ থেকে তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। হয়েছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভাপতি ও আইনমন্ত্রী। কিন্তু অচিরেই তাঁর অনেক প্রত্যাশার অপমৃত্যু হতে শুরু করে। ক্রমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৫০-এর দাঙ্গার পর তিনি হতাশ হয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর মোহভঙ্গ এবং তফসিলিদের প্রতি জিন্নাহ-উত্তর পাকিস্তানি নেতৃত্বের নেতিবাচক ভূমিকার কথা বলে যান। ভারতে যাওয়ার পরও জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি অবহেলিত-নিপীড়িত তফসিলিদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে গেছেন। বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তর বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেও যোগেন মণ্ডল আজ এ দেশের মানুষের কাছে একটি অজানা বা প্রায় বিস্মৃত নাম। এই বইয়ে লেখক আলতাফ পারভেজ নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বগুণ, তাঁর সংগঠন প্রতিভা, ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন, আজকের পাঠককে যা ইতিহাসের এক অনালোচিত অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করবে।

যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ

# যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ

আলতাফ পারভেজ

প্রথমা

প্রথমা

যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮০০৮১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল

মুদ্রণ : আর কে প্রেস প্রিন্টার্স
২৫৭ ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

লেখকের ছবি : সুদীপ্ত সালাম

মূল্য : ৩০০ টাকা

Jogen Mondoler bohujonbad O Deshbhag
by Altaf Parvez
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 300 only

ISBN 978 984 525 003 0

# ভূমিকা

এই গ্রন্থ মূলত ১৯৪৭-এর পূর্বাপর সময়ে বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে দলিত-তফসিলিদের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ভূমিকা খুঁজে দেখার খসড়া চেষ্টা। একই সঙ্গে এটা দলিত-তফসিলিদের প্রধান এক রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে যোগেন মণ্ডলের একটি রাজনৈতিক জীবনীর প্রাথমিক কাঠামোও বটে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'দেশভাগ'-এর বিবরণ বরাবরই বর্ণহিন্দু আর মুসলমানদের ইতিহাসরূপে চর্চিত হয়ে চলেছে। তাতে দলিত-নমশূদ্র-আদিবাসীদের তৎকালীন ভূমিকা মোটাদাগে উপেক্ষিত, অনালোচিত। সে কারণে যোগেন মণ্ডলের অস্তিত্বও 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ'গুলোতে দু-একটি পাদটীকার অতিরিক্ত কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। কেন ভারতবিষয়ক রাজনৈতিক সাহিত্যে 'বাকেরগঞ্জের যোগেন মণ্ডল'কে 'বাংলার আম্বেদকর' বলা হয়; সুনির্দিষ্টভাবে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে কেন তিনি পৃথক, সেটা আমরা আজও ভালোভাবে জানি না। গত ৭০ বছর যাবৎ এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। একে বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চার এক বিশাল দেউলিয়াত্বই বলা যায়। আবার ঐতিহাসিক বিবরণে কীভাবে শ্রেণিগত উপেক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আড়াল কাজ করে, তারও দৃষ্টান্ত এটা।

মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের বাইরে সর্বোচ্চ যে দলটি বাংলাদেশের ইতিহাসবিদদের মনোযোগ পেয়েছে তা হলো ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। কিন্তু রাজবংশী ও নমশূদ্রদের মতো বড় বড় জনগোষ্ঠীরও যে বাংলায় রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছিল এবং ১৯৪৭-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উত্থান-পতনে তাদের সেই রাজনীতির পরিণতি ও পুনর্বিন্যাস কীভাবে ঘটল, সেই অনুসন্ধান প্রায় অনুপস্থিত আজও। বর্তমান লেখা সেই উপেক্ষা সংশোধনের একটি প্রাথমিক চেষ্টা। ভবিষ্যতে এই অনুসন্ধান আরও জারি থাকবে এবং

আগ্রহীরা তাতে শামিল হবেন বলেও প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বাংলায় তফসিলি বহুজননাদের উত্থান ও পরাজয়পর্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে আপাতত সংযুক্তিতে দুটি দলিল সংযোজিত হলো—পাঠক আগ্রহী হলে ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলোতে তা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

এটা সত্য যে ঔপনিবেশিক উপমহাদেশ স্বাধীনতার নামে কেন ভাঙল তা নিয়ে শত শত মননশীল অনুসন্ধান রয়েছে। ইতিমধ্যে পুরো অঞ্চলের উচ্চবর্গীয়রা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করে অনেকখানি স্থিতুও হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ—উভয় এলাকায় দলিত-তফসিলিদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া দেশভাগ-পরবর্তী সত্তর বছরেও সম্পন্ন হয়নি। আজও তাঁদের বর্তমানে রক্তাক্ত পরাজিত অতীত প্রবলভাবে উপস্থিত। ফলে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনসমাজেও যোগেন মণ্ডল পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে গেছেন, এমন বলা যায় না। কিন্তু মুখে মুখে স্থানান্তরিত সেই ইতিহাস দু-তিন প্রজন্মের শেষলগ্নে এখন হারাতে বসেছে। বিকৃত হচ্ছে। ফলে দেশভাগ কালে দলিত-তফসিলি ও অন্যান্য জনজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ অতি জরুরি। যদিও এ ক্ষেত্রে ইংরেজিতে গবেষকরা অনেক কাজ করেছেন, কিন্তু বাংলায় তেমনটি হয়নি। এ ক্ষেত্রে পাঠক মতামত জানিয়ে এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলো সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করবেন বলে আশা করছি। এ লেখায় বিবাদিত কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন উৎপল বিশ্বাস। এছাড়া পুরো লেখায় বিভিন্ন স্থানে গবেষক মাশায়ুকি উস্তদা, শেখর বন্দোপাধ্যায় এবং দ্বৈপায়ন সেনের বিভিন্ন লেখা থেকে বিপুল সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁরাই বর্তমান লেখার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন।

এই গ্রন্থ রচনার নানা পর্যায়ে আরো সাহায্য করেছেন জাকির হোসেন, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, মাজহারুল ইসলাম, সেকেন্দার আলী মিনা ও সাব্বির আজম। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

**আলতাফ পারভেজ**
ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৮
altafparveaz@yahoo.com

সূচিপত্র

# ১৯৪৭-পূর্ববর্তী দলিত১ ও মুসলমান সমাজ
## যোগেন মণ্ডলের পটভূমি

খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৃহৎ (রয়েল সাইজ, ১ হাজার ৫৯ পৃষ্ঠা!) এক উপন্যাস লিখেছেন। যার নাম *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। এই নামের ভেতর শ্লেষ আছে, নাকি প্রশংসার অর্ঘ্য আছে—সে নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। অর্ঘ্য থাকলে সেটা যেমন যোগেনের প্রাপ্য, শ্লেষ থাকলে সেটা বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষকদের জন্যই মানানসই হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যোগেন মণ্ডলই একমাত্র জনপ্রতিনিধি, যিনি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সর্বভারতীয় মন্ত্রিসভায় কাজ করেছেন, জিন্নাহর সঙ্গে অবিভক্ত পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় ছিলেন, সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে বিভাগপূর্ব বাংলায় মন্ত্রিত্ব করেছেন। যোগেনের এরূপ রাজনৈতিক সফলতা ছিল 'ছোটলোক' পরিচয়কে রাজনৈতিকভাবে মহিমান্বিত করার মধ্য দিয়ে।

তবে লক্ষণীয় যে সাত-আট দশক পূর্বে প্রান্তিক জনপদ বাকেরগঞ্জ তথা পূর্ববঙ্গ থেকেই নমশূদ্র যোগেন মণ্ডল অবিভক্ত বাংলায় নতুন এক 'অংশগ্রহণমূলক' (Inclusive) রাজনীতির সূচনা ঘটিয়ে সাময়িকভাবে হলেও 'মূলধারা'র শহুরে এলিট রাজনীতির তৎকালীন ছকটি যে পাল্টে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য ছাপ নেই। এখানে রাজনৈতিক সাহিত্য বরাবরই ১৯৪৭-এর পূর্বাপরকে সাম্প্রদায়িকতায় ভরা সময় হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির ইতিবাচক ঐতিহ্যের কোনো নিশানা নেই তাতে।

কিন্তু কেমন ছিল ১৯৪৭-পূর্ববর্তী বিংশ শতাব্দীর গোড়ার সময়কার রাজনীতির উল্লিখিত ছকটি? কিংবা তারও খানিক আগে? রাজনীতির সেই

দক্তপাটি বুঝতে এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তাঁর দলিত-নমশূদ্র সহযোগীরা হাতে কীভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং উক্তরূপ হস্তক্ষেপের কারণ কী, সেটা দেখতে আমাদের তখনকার ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজের ছকটির দিকেই প্রথমে মনোযোগ দিতে হবে।

বাংলায় তখন একটা ক্রান্তিকাল চলছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজের ক্ষমতা-সম্পর্কের 'ভারসাম্য' তখন ভেঙে পড়ছে, ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে পুঁজি করে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামাজিক গতিশীলতা ক্রমে পূর্বাবস্থা থেকে বাড়ছে।[৭] পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ববাজারের সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। আবার জনসংখ্যার বড় এক অংশ তখনো পুরোনো জাতি ও পেশার বিভাজনে আটকে ছিল। অবশ্যই কৃষিজীবী বাংলা তখন 'খাজনাভোগী' ও 'খাজনা প্রদানকারী' দুই জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রথমোক্ত দলে ছিলেন মূলত 'উঁচু জাত'-এর হিন্দু এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলমান 'সৈয়দ'রা। দ্বিতীয় দলভুক্তরা ছিল মর্যাদাচ্যুত হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান 'চাষি সম্প্রদায়'। এই ব্যবধানকে আরও রুক্ষ রূপ দিয়েছিল উচ্চশ্রেণির সুদি মহাজনরা। যোগেন মণ্ডল সে সময়কার চিত্রটি তুলে ধরছেন এভাবে:

> বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নমশূদ্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল রয়েছে। মুসলমানরা ছিল মূলত কৃষক-শ্রমিক, অস্পৃশ্যরাও তাই। মুসলমানদের একটি অংশের মতো নমশূদ্রদের একটি অংশও ছিল জেলে। দ্বিতীয়ত, তারা উভয়েই ছিল লেখাপড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী।[৮]

বাংলার শ্রেণিভেদ-জাতিভেদ-অর্থনৈতিক ভেদ এভাবেই এক সরলরেখায় এসেছিল তখন। ১৮৭২ সালের বাংলা শুমারিতে দেখা যাচ্ছে, ১ কোটি ৭৬ লাখ মুসলমানের মধ্যে মোগল-পাঠান-শেখ-সৈয়দ রয়েছে মাত্র তিন লাখের মতো। আর প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ হিন্দুর মধ্যে স্পৃশ্য ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ রয়েছে মাত্র ২৩ লাখ। বাকিরা শূদ্র বা অসৎ শূদ্র। দেখা যাচ্ছে, বাংলার তখনকার ৩ কোটি ৬১ লাখ জনসংখ্যার মূল অংশই সাধারণ মুসলমান ও অস্পৃশ্য বা প্রায় অস্পৃশ্য সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালি।[৯] প্রায় অধিকাংশ এঁরা গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাসিন্দা ছিলেন। 'বাংলায় ১৮৯১ সালে মোট জনসংখ্যার ৯৪ ভাগ এবং ১৯২১ সালে ৯৩ ভাগ ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যা', লিখেছেন ইতিহাসবিদ সুগত রায়।[১০]

অন্যদিকে ১৯৩১ সালের সেনসাস কমিশনার তখনকার ব্রিটিশ বাংলায় অন্তত ৬০ লাখ লোককে অস্পৃশ্য হিসেবে উল্লেখ করছেন, যারা তখন অন্তত

৪০টি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত ছিল এবং 'যাদের সংস্পর্শে এলে উচ্চশ্রেণির 'পবিত্র' হওয়ার প্রয়োজন হতো।'[৬] স্পষ্টত অনুমান করা সম্ভব যে গ্রামীণ বাংলা তখন দুটি 'সমাজ'-এ বিভক্ত; একটি অচ্ছুত সমাজ এবং অপরটি ব্রাহ্মণ-সৈয়দদের সমাজ।

তবে বিগত শতাব্দীর শুরুটা ছিল সমাজ-সম্পর্কে উপরিউক্ত উচ্চ ও নীচু শ্রেণির দূরত্ব ক্রমে প্রকাশ্য হওয়ার কাল। ইতিহাসের এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও পেশার কারণে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকলেও দরিদ্র মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের মর্যাদাহীন জীবনের বাস্তবতাকে সমান অধিকারের দাবির ভূমি হিসেবে দেখতে পাচ্ছিল। ফলে মুখ্যত নমশূদ্র ও রাজবংশী[৭] ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর অচ্ছুত হিন্দুদের সঙ্গে 'ম্লেচ্ছ'দের একটি সাধারণ গোষ্ঠীচেতনা বিকাশের প্রকৃতই বাস্তব অবস্থা এসেছিল ইতিহাসে তখন। বিশেষত ১৯৩০-এর দশকের মন্দা[৮] এই গোষ্ঠীচেতনাকে হয়তো তীব্রতা দিয়ে থাকবে। হিন্দু তরফ থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং মুসলমান তরফ থেকে আউলিয়া-দরবেশদের প্রভাব এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকাই রাখছিল। তারাও পরোক্ষে জাতপাতের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিল। দলিত-নমশূদ্রদের জাত-পাতবিরোধিতারই আরেকটি প্রকাশ ছিল বাংলায় খ্রিষ্টধর্মের প্রসার।[৯] অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয়রাও ক্রমে নীচু শ্রেণির মর্যাদাসংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং প্রতিবাদী মনোভঙ্গিতে ছিল বিরক্ত। নানাভাবে এরূপ বিরক্তির প্রকাশ ঘটছিল। যেমন জয়া চ্যাটার্জি একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> (একপর্যায়ে) গোয়ালাদের পরিবর্তে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে দুধ নিতে পছন্দ করত। কেননা গোয়ালাদের বৈশ্য মর্যাদার দাবি হজম করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।[১০]

কেবল গোয়ালা নয়, ইতিহাসের এ সময় জাতপাতের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে কৈবর্তরা মাহিষ্য পরিচয় চাইছিল, রাজবংশীরা চাইছিল কায়স্থ পরিচয়।

দরিদ্র মুসলমান ও দলিত নমশূদ্রদের মৈত্রীচেতনা এবং উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান দূরত্বের সে সময়কার আরেকটি প্রবল প্রকাশ ছিল 'স্বদেশি আন্দোলন'। ১৯০৫-এর এই আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন ইতিহাসবিদেরা। কিন্তু এই আন্দোলনের মূল শক্তিভিত্তি ছিল মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত হিন্দু তরুণেরা। ব্যাপক আবেগগত আহ্বান সত্ত্বেও এই আন্দোলন তখনকার নিম্নবর্গীয় মুসলমান ও হিন্দু নমশূদ্রদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

এমনকি পরে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনেও (১৯১৯-২২) উপরিউক্ত দুই সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল মৃদু। এরূপ 'উগ্রতর জাতীয়তাবাদী প্রয়াস'-এ শামিল হওয়াকে তারা উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বলেই মনে করেছিল, যা প্রমাণ করে, শেষোক্ত দুই জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিদিনকার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বাইরে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামকে দেখতে প্রস্তুত ছিল না। তারা যে কেবল নীরবে স্বদেশিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিল তা নয়, বরং এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতেও তৎপর ছিল। এরূপ সাক্ষ্য মেলে, বাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার এবং ল্যান্সলট হেয়ারের আমলে (১৯০৫ এবং ১৯০৭)। নমশূদ্ররা স্মারকলিপি দিয়ে এ সময় ব্রিটিশদের বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় এবং বিনিময়ে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিভিন্ন রূপ অধিকার দাবি করে। ১৯০৬-এর ২ অক্টোবর আজকের মতুয়া আন্দোলনের ভরকেন্দ্র ওড়াকান্দিতে (গোপালগঞ্জ) ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে সভা ডেকে বঙ্গভঙ্গের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ১৯০৮-এর মার্চে এ-ও দেখা যায়, খুলনায় সভা ডেকে নমশূদ্র সম্প্রদায় অনুমুক্তভাবে ব্রিটিশ পণ্য কেনার অধিকার চাইছে। স্পষ্টতই এসব ছিল 'স্বদেশি চেতনা'র প্রত্যাখ্যান।[১১] যে বিষয়ে স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হিসেবে খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৮ সালের জুলাইয়ে (বাংলা ১৩১৫) 'সদুপায়' নিবন্ধে তাঁর মূল্যায়ন করছেন এভাবে :

> বরিশাল হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।...অনেক স্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে...। আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর কোন ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।.. বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কত দূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাদের মন খোয়াইলাম।...আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি

ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই।

> ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সে জন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহ বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি।...
>
> কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ন এই অর্থেও খুবই সঠিক যে, মুসলমান ও দলিত নমশূদ্রদের তরফ থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যানের অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণগুলো বাংলার ইতিহাসে সামান্যই অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে।[১২]

প্রকৃতপক্ষে আমাদের 'দেশভাগ-সাহিত্য'-এ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৪৭-পূর্বাপর ঘটনাবলিকে যেভাবে 'হিন্দু' বনাম 'মুসলমান' দ্বন্দ্বরূপে উপস্থাপন করা হয় তা সমস্যাপূর্ণ। এরূপ উপস্থাপনা অতি সরলীকৃত এবং তৎকালীন সমাজের জটিল রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবনে সাহায্য করার পরিবর্তে বিভ্রান্তি বাড়ায়। সেখানে দেশভাগের পরিস্থিতিতে নারীর কর্তৃত্বশীল ভূমিকার কোনো উল্লেখ নেই, অঞ্চলগত বিশেষত্বের কোনো ব্যাখ্যা নেই এবং বিশেষভাবে নেই বর্ণগত টানাপোড়েনের রাজনৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা।[১৩] যেমন, ১৯১১ সালের লোকশুমারিতে দেখছি বাকেরগঞ্জে 'হিন্দু সমাজ'-এর মধ্যে ৪৫ ভাগই ছিল নমশূদ্র তথা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। হিন্দু সমাজের মধ্যকার এই দুই ধারা তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে এত পৃথক দুটি গোষ্ঠী যে, তাকে 'হিন্দু-সমাজ' ধারণা দিয়ে সামান্যই বোঝা সম্ভব। খোদ 'হিন্দু-সমাজ'-এর মধ্যে তখন দশকের পর দশক ধরে প্রবহমান মর্যাদা ও আত্মসম্মানের লড়াই চলছিল। ১৮৭৩-এ এক শান্তিপূর্ণ বয়কট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নমশূদ্ররা ১৯১১ নাগাদ উচ্চবর্ণের দেওয়া 'চণ্ডাল' পরিচয় পাল্টে নতুন পরিচয়ে নিজেদের শুমারি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।[১৪] ১৯২১ এ-ও শুমারিতে তাদের 'নমশূদ্র' ('সম্মানিত শূদ্র') পরিচয় টিকে থাকে এবং 'চণ্ডালত্ব'-এর অন্তত প্রশাসনিক মৃত্যু ঘটে।

তথাকথিত 'হিন্দু সমাজ'-এর অভ্যন্তরকার এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৭২-এর শুমারির পরপর বাকেরগঞ্জ জেলার মাদারীপুর থানার (ফরিদপুর জেলা হয় ১৮৭৪-এ) আমগ্রাম থেকে। সেখানে চরণ ট্যাপা নামের একজন ধনাঢ্য নমশূদ্রের পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি থেকে প্রথমোক্তদের আন্দোলনের সূত্রপাত।[১৫] পরে এই আন্দোলন এমনকি বাংলার কারাগারগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, সেখানে দলিত নমশূদ্র বন্দীদের ময়লা পরিষ্কারের কাজে বাধ্য করা হচ্ছিল। ১৮৯১ নাগাদ বাংলার দলিতদের 'আত্মমর্যাদা'র ওই লড়াই থিতিয়ে আসে। পরে প্রশাসনিক ভাষায় আরও অনেকের সঙ্গে তাঁরাই হন 'তফসিলি জাতি'।[১৬] এদেরই এক রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর ছিলেন যোগেন মণ্ডল।

এরূপ তফসিলি জাতিগুলোর আরও প্রবল সংগঠনও ছিল তখন। যেমন যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরকে ঘিরে গড়ে ওঠা মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়, যাদের প্রধান গুরু ছিলেন শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। কিন্তু ওই মতুয়া গুরু 'পার্থিব সম্পদ ও সম্মান' অর্জনের লক্ষ্যে নমশূদ্রদের শিক্ষা ও চাকরির দিকে যতটা আকর্ষিত করছিলেন, ততটা করেননি সামাজিক অন্যান্য সমধর্মী বর্ণের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীর বিষয়ে। উপরন্তু সমাজে উঁচু-নীচুর বিভেদ ঘোচানো বা কাঠামোগত পরিবর্তনের চেয়েও তাঁরা বেশি চাইছিলেন নমশূদ্রদের ধর্মীয়ভাবে উঁচু করে তুলতে এবং তা শাস্ত্রীয় নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হলেও। তবে এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে, গুরুচাঁদ ঠাকুরের পিতা মতুয়া আন্দোলনের মুখ্য ব্যক্তি হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-৭৮) নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষিজীবীদের রক্ষা করতে ওড়াকান্দির উত্তর-পশ্চিমে জোড়াসুরে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপীনাথপুরে নীলকুঠি উচ্ছেদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মূলত ডঙ্কা, কাঁসা, শিঙা নিয়ে শোভাযাত্রার আদলেই এরূপ অভিযান পরিচালিত হয়।[১৭]

অর্থাৎ বাংলার বৃহত্তর কৃষিজীবী নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের মনোভাবে সামাজিক সম্মানের অভিলাষের পাশাপাশি আর্থিক শোষণমুক্তির চেতনাও প্রবল ছিল। আর এ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে মিল ছিল দরিদ্র মুসলমানদের। এরূপ দলিত হিন্দু ও মুসলমানরা যে ধর্মের পরিসর অতিক্রম করে তাদের 'আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আকুতি'র বিষয়ে কত সচেষ্ট ছিল, তার প্রমাণ ১৯৩৭-এর নির্বাচনে অসংরক্ষিত আসনে স্বতন্ত্র হয়েও কংগ্রেসের কায়স্থ প্রার্থীর বিপরীতে নমশূদ্র যোগেন মণ্ডলের বিজয়। যোগেন মণ্ডলের এই বিজয় এটাও সাক্ষ্য দেয়, ভারতের স্বাধীনতাকালীন রাজনীতিতে দলিত ও নমশূদ্ররা এক পৃথক

সক্রিয় জনগোষ্ঠী ছিল।[১৮] ফলে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামকে যেভাবে কেবল মুসলমান ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাঠামোতে ফেলে দেখা হয়, সেটা প্রকৃতই সমস্যাপূর্ণ। এর ফলে ভারত ভাগ-সম্পর্কিত রাজনীতিতে দলিতদের ভূমিকা অনেকখানিই অনালোচিত থেকে যায়। অনালোচিত থাকে তার পরিণতিও। অথচ উপনিবেশমুক্তির সংগ্রামের শেষলগ্নে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তা এবং মুসলমান জাতীয়তার উচ্চবর্ণীয় পরিমণ্ডলের বাইরে তৃতীয় একটি স্বতন্ত্র ধারাও ছিল 'মুক্তি'র লক্ষ্যে সচেষ্ট। সেই ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পশ্চিম-উত্তর ভারতে আম্বেদকর, দক্ষিণ ভারতে পেরিয়ার[১৯] এবং বাংলায় প্রথম পর্যায়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর ও পরবর্তীকালে যোগেন মণ্ডল। তখনকার কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ধারাকে যদি তৃতীয় ধারা হিসেবে শনাক্ত করা হয়, তাহলে দলিত-নমশূদ্রদের ধারাটিকে রাজনীতির চতুর্থ স্রোত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু কোনোভাবেই আলোচনার বাইরে রাখা যায় না।

বস্তুত ১৯০০-এর পর থেকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কৌশল হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায় যেমন 'পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা'র জন্য লড়ছিল, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ক্রমে ক্রমে একই দাবির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে উভয়ে সম্ভাব্য 'ভারত ফেডারেশন'-এর মধ্যেই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কৌশল নিয়ে এগোচ্ছিল। বিশেষ করে লর্ড সাউথবরোর নেতৃত্বে গঠিত ভোটাধিকারবিষয়ক কমিটি (জানুয়ারি ১৯১৯) এবং স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের কাছে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) বি আম্বেদকর দলিতসহ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চাইছিলেন, যেখানে তারা নিজেদের ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে। অন্যদিকে কংগ্রেস এই সময় চাইছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য কিছু মনোনীত আসন।[২০] পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যোগেন মণ্ডল কীভাবে বাংলায় আম্বেদকরের প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন এবং দেশভাগ কীভাবে এই মৈত্রীতে বিভক্তি ঘটিয়েছিল।

নিম্নবর্ণের অধিকার প্রশ্নে গান্ধী-নেহরুদের কংগ্রেস এবং যোগেন-আম্বেদকরপন্থীদের অবস্থানের পৃথকত্ব সবচেয়ে স্পষ্ট হয় যেসব ঘটনায়, তার একটি ছিল ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় (১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনে সৃষ্ট) তফসিলি নেতা এম সি রাজা কর্তৃক ১৯৩৩-এর ২৪ মার্চ অস্পৃশ্যদের স্বার্থে বিল আনার পর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায়। Untouchability Abolition Bill নামের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস

সদস্যদের প্রতিবাদ সেদিন এত ব্যাপক ছিল যে পরে ব্রিটিশ শাসকেরা বিলটি অ্যাসেম্বলি থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য করেছিল এম সি রাজাকে।[২১] সবচেয়ে জোরে প্রতিবাদকারী হিন্দু সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলা প্রদেশের, যা প্রমাণ করে যে 'স্বধর্মীয়' নিম্নবর্ণীয়দের মানবিক মর্যাদার চেয়েও অভিজাত হিন্দু নেতৃত্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'পবিত্রতা' ও 'বিশুদ্ধতা'র বর্ণবৈষম্যমূলক সাংস্কৃতিক ধারণাসমূহ।

জাতপাতের দূরত্বের মতোই সাম্প্রদায়িক বৈরিতার প্রসারেও প্রায় একই রূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় ১৯২৮-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন বিল' উপস্থাপনকালীন ঘটনাবলিতে। Untouchability Abolition Bill-এর মতোই এই বিলটিও প্রথমে পাস করানো যায়নি উচ্চবর্ণের হিন্দু সদস্যদের বিরোধিতায়। তাঁদের বিরোধিতার মূল কারণ ছিল, এই বিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস হিসেবে জমির মালিকদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই ধরনের বিরোধিতার মুখে ১৯২৭ থেকে অন্তত দুই দফা এই বিল উত্থাপন করেও প্রত্যাহার করে নিতে হয়। এই বিল নিয়ে বিতর্ককালেই চতুর্থ ব্যবস্থাপক সভায় (১৯২৯-৩৬) মন্ত্রী শিব শেখরেশ্বর রায় (স্বরাজ দল) পদত্যাগ করেছিলেন। পরে ১৯৩০-এর ২৬ আগস্ট জমিদারশ্রেণির প্রতিনিধিদের ওয়াক আউটের মুখে এই বিল অনুমোদিত হয়। ইতিমধ্যে জমিদারদের স্বার্থে করের ক্ষেত্রে তাদের অনেক ছাড়ও দেওয়া হয়। এই আইনের ওপর ভিত্তি করেই বাংলায় জেলা স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরূপ উদ্যোগ স্বভাবতই নিরক্ষর দলিত ও মুসলমান সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল এবং নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

Untouchability Abolition Bill এবং 'বেঙ্গল (রুরাল) প্রাইমারি এডুকেশন বিল'-এর ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণির রাজনীতিবিদদের বিরোধিতার ঘটনায় দরিদ্র সমাজের যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হয়, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯২৮ সালে 'বেঙ্গল টিন্যান্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' ('বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল')-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের অবস্থান নেওয়ার ঘটনায়ও। এই আইন জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। যদিও সংশোধিত আইনটি শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের একজন বাদে সব সদস্য তার বিপক্ষে ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের চাপে

আইনে এমন সংশোধনী যুক্ত করতে হয় যে যাতে মূল উদ্দেশ্যগুলির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। এই আইনে দখলি জমিতে নিম্নস্বত্বের রায়তদের বারো বছর পর রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে অধিকার লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে রাজস্ব বাড়ানো এবং রাজস্ব না দেওয়া হলে জমি থেকে তাদের উৎখাতের অধিকার জমিদারদের হাতেই থেকে যায়।

আইনি পরিমণ্ডলে উচ্চশ্রেণির ধারাবাহিক বিরোধিতা ইতিহাসের ওই সময় এই বার্তাই দিচ্ছিল, উচ্চশ্রেণি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামাজিক মর্যাদার একচেটিয়াত্বে কোনোরূপ ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু এতে রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাসের অধিকতর ঝুঁকিই ডেকে আনছিলেন তাঁরা।

তবে নানান মৌলিক সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী উচ্চশ্রেণির এরূপ আত্মবিনাশী-প্রতিরোধ সত্ত্বেও দলিত নেতারা যে হতোদ্যম ছিলেন না, তার নজির ১৯৩৭-এর নির্বাচনে যোগেন মণ্ডলের বিজয়। এই বিজয় যোগেন মণ্ডলকে ক্রমে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিতে ঠেলে দেয় দলিত বা তফসিলিদের নতুন এক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাসহ। যে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে এই আলোচনায় উপমহাদেশের প্রথম 'বহুজনবাদী' রাজনীতি হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। যে রাজনীতিকে যোগেন বলতেন 'মনুবাদ' বিরোধিতা। অর্থাৎ জাতিঘৃণা ও সামাজিক বিভেদবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। যেসব ধর্মীয় প্রথা শোষণের পাটাতন হিসেবে কাজ করে, তার বিরোধিতায় আন্তঃধর্মীয় মৈত্রীর ডাক দিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। এই রাষ্ট্রদর্শনের একটা প্রবল জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকও রয়েছে, যা বিশেষভাবে বিকশিত করেন বৃহত্তর ফরিদপুরকেন্দ্রিক 'মতুয়া'রা।[২২] তবে তফসিলিদের রাষ্ট্রদর্শনের সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক নিয়ে নয়, বরং বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-৪৭) কীভাবে এই সম্প্রদায়ের বহুজনবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটেছিল এবং কীভাবে পরবর্তী দশকগুলোতে (১৯৪৭-৬৭) শেষ পর্যন্ত তা আক্রান্ত ও পরাস্ত হয়েছিল, তারই বিবরণ এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। মূলত উল্লিখিত তিন দশকজুড়ে তফসিলিদের প্রধানতম এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং দলিত-নমশূদ্র রাজনীতিকে শনাক্ত করাই এই পর্যালোচনায় মুখ্য বিবেচনা হিসেবে কাজ করেছে। যদিও নমশূদ্র ও তফসিলিদের চিন্তার জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকটিও তাঁদের রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে।

# 'বাকেরগঞ্জের যোগেন মণ্ডল' : আবির্ভাবপর্ব

বাকেরগঞ্জ (বর্তমানে বৃহত্তর বরিশাল) থেকেই সূচিত যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি। তাঁর জন্ম গৌরনদী থানার মৈস্তারকান্দি গ্রামে ১৯০৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। ১৯২৪-এ তিনি বার্থী তারা ইনস্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯২৬-এ বিএম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পড়ালেখা শেষ করেন[২৩] এবং ১৯২৯-এ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি নেন। এরপর তিনি কলকাতা এসেছিলেন আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য। ১৯৩৪ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৬-এর জানুয়ারিতে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হন। এ সময় কলকাতায় আইনজীবী চন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে জুনিয়র হিসেবে 'স্মল কজ কোর্ট'-এ কাজ করতেন তিনি। বরিশালে কোর্টে কাজ করতেন তিনি কুলদা রঞ্জন দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে। বরিশালে আইন পেশায় কার্যক্রম শুরুর পরের বছরই তিনি জেলা বোর্ডের সদস্য হন।

যোগেন মণ্ডলের শিক্ষাজীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর পুত্র লিখেছেন, বাকেরগঞ্জের গৌরনদীতে যে মাধ্যমিক স্কুলে তিনি পড়তেন, তাতে তিনি ছাড়া সবাই ছিল ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী। অথচ তখনকার (১৯১১) এক হিসাবে দেখা যায়, বাকেরগঞ্জে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে ৪৫ ভাগই ছিল নমশূদ্র দলিত।[২৪] উপরিউক্ত তথ্য থেকে তখনকার সমাজে 'অচ্ছুত'দের শিক্ষা পরিস্থিতি আঁচ করা যায় কিছুটা। কলকাতায় তিনি একটি বাড়িতে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর বিনিময়ে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পান এবং সেভাবেই উচ্চশিক্ষা শেষ করেছিলেন।

বাংলার ইতিহাসের এই সময়টি মুখ্যত যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তাকে গবেষক জয়া চ্যাটার্জি তাঁর বহুল আলোচিত গবেষণায় (*বাংলা ভাগ হলো*) শিরোনাম দিয়েছেন 'মফস্বলের অভ্যুদয়' হিসেবে। অর্থাৎ মফস্বলের বিবাদিত বিষয়সমূহ তখন রাজনীতির কেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। এর শুরু 'ভারত শাসন আইন'-এর সংস্কারের মধ্য দিয়ে। এই আইন

নির্বাচকমণ্ডলীর পরিসর বাড়িয়েছিল। আবার আইনসভার হিন্দু ও মুসলমান আসনগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠই গ্রামীণ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সাধারণ বা হিন্দু আসনের মাত্র ১২টি এবং মুসলমান আসনের মাত্র ৬টি শহর এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সংস্কার রাজনীতিকে কলকাতা থেকে গ্রামে ঠেলে দেয়।[২২] আর গ্রামে দরিদ্র মুসলমান ও দলিত নমশূদ্ররা ছিল সংখ্যায় অধিক। ইতিমধ্যে শিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়ে মুসলমান ও নমশূদ্র উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজন ছিলেন যোগেন মণ্ডল। তাদেরই আরেক দল ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। এভাবে নতুন চরিত্রদের হাত ধরে ক্রমে জমিদার-প্রজা, সুদ ব্যবসায়ী-ঋণগ্রহীতা, জোতদার-বর্গাদার সংঘাতের উত্তেজনাও প্রাদেশিক রাজনীতির পুরোনো বিষয়সূচির স্থান দখল করে নেয়।[২৩]

ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটিকে তালুবন্দী করতে দেরি করেননি যোগেন্দ্রনাথ। আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবনের পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনও শুরু করে দেন এবং দ্রুতই প্রায় পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদ হয়ে পড়েন। জীবনের শুরুতে কংগ্রেসের চৌহদ্দিতেই ছিলেন যোগেন মণ্ডল।[২৪] সুভাষ বসুকে ঘিরে নতুন রাজনীতির স্বপ্ন দেখতেন তিনি। ১৯৩৭-এ এমএলএ হওয়ার পর ১৯৪০-এর জুনে বরিশালেও নিয়ে এসেছিলেন সুভাষকে। একই সঙ্গে নিজের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক-দার্শনিক অবস্থানও তৈরি হচ্ছিল তখন। যোগেনের পৃথক সেই অবস্থানের মূল দিক হলো নিপীড়িত বর্গের জন্য 'সুবিধাজনক' অবস্থা তৈরি এবং এই বর্গগুলোর ঐক্যের তাগিদ। যোগেনের রাজনৈতিক জীবন ভারত-পাকিস্তানের 'স্বাধীনতা'র জন্য ততটা উৎকণ্ঠিত ছিল না, যতটা না উৎকণ্ঠিত ছিল শূদ্রদের জন্য 'সুবিধা আদায়ে'র লক্ষ্যে। তবে স্পষ্টতই নিম্নবর্গের এই সুবিধা আদায়ের কৌশলের গভীর রাজনৈতিক মানে ছিল তখন এবং এখনো। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে এরূপ 'সুবিধা আদায়ে'র রাজনীতিই মূলত দলিত-নমশূদ্রদের রাজনীতিতে অভিষেক বেগবান করেছিল এবং উচ্চবর্ণের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ তৈরি করে।

ইতিহাসের ওই সময়টায় সুভাষের সঙ্গে যোগেনের যে স্বল্পকালীন মৈত্রী গড়ে ওঠে, তা দীর্ঘায়িত হলে বাংলার রাজনীতিতে তার ভিন্ন এক ছাপ পড়ত। সুভাষ বরিশালে ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন করতে এসে ১৯৪০-এর জুনে বাণীপীঠ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে সভা করেন, তাতে যোগেনকে সভাপতিত্ব করতে দিয়েছিলেন অবলীলায়; আবার মণ্ডলও সুভাষের সঙ্গে মৈত্রীর পুরো

সময়টিতে তফসিলি স্বার্থের প্রশ্নই উত্থাপন করে গেছেন বারবার। তবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় রাজনীতির অন্তর্বিরোধ এই মৈত্রীকে এগোতে দেয়নি। ১৯৪০-৪১-এ ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যোগেনের বৃহত্তর রাজনৈতিক মৈত্রীর যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, সেটা সুভাষ বসুর রহস্যময় অন্তর্ধান (জানুয়ারি ১৯৪১) এবং শরৎ বসুর গ্রেফতারের (ডিসেম্বর ১৯৪১) পর আর এগোয়নি।

অন্যদিকে দল থেকে সুভাষের বহিষ্কারের ঘটনা কংগ্রেসের প্রতিও চূড়ান্ত মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল যোগেনের। বলা যায়, এই সময়েই প্রথম তিনি স্পষ্টত মূলধারার 'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি' থেকে বেরিয়ে আসেন, যে রাজনীতিতে ছিল মূলত হিন্দু ভদ্রসমাজের আধিপত্য।[28] পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতার পাটাতনে দাঁড়িয়ে এ সময় যোগেন ভাবতে শুরু করেন, ভারতবর্ষে দলিত ও মুসলমানরা হলো প্রধান দুই নিপীড়িত বর্গ; এদের ঐক্য প্রয়োজন। উপনিবেশমুক্ত নতুন দক্ষিণ এশিয়ায় বর্ণব্যবস্থার বাইরে থাকা অচ্ছুত 'তফসিলি হিন্দু' এবং 'অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি'র সঙ্গে 'ম্লেচ্ছ' মুসলমানদের ঐক্যের মধ্য দিয়ে 'বহুজন'বাদী রাজনীতি গড়ে তোলা না গেলে ব্রিটিশ-পরবর্তী সম্ভাব্য যেকোনো 'সমাধান'-এ ঔপনিবেশিক আলোকপ্রাপ্তরাই নেতৃত্বে ও নীতিনির্ধারণে থেকে যাবে। এই রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়েই বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলন সাড়া ফেলতে পারেনি দক্ষিণবঙ্গে। ফলে যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি বাংলার প্রথাগত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কোনো ধারা হিসেবে নয়, নতুন এক চেতনা[29] নিয়ে হাজির হয়েছিল তখন। ১৯৪২-এর জুলাইয়ে (১৮-১৯ জুলাই) যোগেন রসিকলাল বিশ্বাসসহ আরও কয়েকজন তফসিলি নেতাকে নিয়ে নিখিল ভারত শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের নাগপুর অধিবেশনে যোগ দেন। এভাবেই ১৯৩৭-এর বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো যোগেনের রাজনৈতিক জীবনে নতুন মোড় ফেরার ঘটনাটি ঘটে। এটা একই সঙ্গে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সময়পর্বে বাংলার রাজনীতিতেও নতুন এক রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেয়।

বাকেরগঞ্জ-ভোলা আসন থেকে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে[30] অশ্বিনীকুমারের ভাতিজা সরলকুমার দত্তকে হারিয়ে যোগেন যে চমক তৈরি করেছিলেন, তাকে বলা যায় বাংলায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী বোঝাপড়া। তবে তা স্থানে স্থানে রীতিমতো সহিংস রূপ নিয়েছিল। উভয় প্রার্থীই ছিলেন গৌরনদীর বাসিন্দা। সরল দত্ত ছিলেন 'অভিজাত পরিবার'-এর সদস্য এবং জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। বরিশালে তখন অশ্বিনীকুমার দত্তের উত্তরাধিকারী হিসেবেই মনে করা হতো তাঁকে। তুলনায় যোগেন ছিলেন

অপরিচিত অস্পৃশ্য এক কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান এবং রাজনৈতিকভাবে সদা উদীয়মান ৩৩ বছর বয়সী এক তরুণ। মাত্র এক হাজার টাকার প্রচার তহবিল সম্বল করে[৩১] নির্বাচনী সভাগুলোতে তিনি হিন্দু বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন, যা বাংলার দলিতদের জন্য ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা এবং আজও মিথরূপে সেই স্মৃতি বইছে বাকেরগঞ্জের নমশূদ্র 'সমাজ'।[৩২]

বাকেরগঞ্জ-ভোলা আসনটি ছিল একটি সাধারণ আসন। অর্থাৎ শিডিউল কাস্টদের জন্য সংরক্ষিত আসন নয়। প্রায় ১ হাজার ৬৫৭ বর্গমাইলজুড়ে নিয়ে এই নির্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লাখ ২৭ হাজার এবং তার মধ্যে শিডিউল কাস্ট ছিলেন ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৯০ জন। ভোটারসংখ্যা ছিলেন নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ৭০ হাজার। ৬২টি নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রায় ৩২ শতাংশ ভোটার ভোট দেন এই নির্বাচনে এবং যোগেন মণ্ডল প্রদত্ত ভোটের ৫৩ শতাংশ পেয়ে বিজয়ী হন।[৩৩] সরল দত্ত ভোট পেয়েছিলেন প্রায় ১০ হাজার এবং যোগেন মণ্ডল পেয়েছিলেন প্রায় ১২ হাজার। একজন তফসিলির বিজয় দেখতে তখনকার প্রচারমাধ্যমও যে প্রস্তুত ছিল না, তার সাক্ষ্য হিসেবে দেখা যায়, *অমৃতবাজার পত্রিকায়*[৩৪] ভোটের ফলাফলটি প্রকাশের সময় শিরোনামে পরাজিত ব্যক্তির নাম দিলেও বিজয়ী ব্যক্তির নাম ছিল অনুল্লেখিত।

> Sj. Saral Dutta Defeated
> Schduled Caste Candidate Elected
> (From our own Correspondent)
>
> Barisal, Jan 26. Mr. Jogendra Nath Mandal (Schduled Caste) a local leader, has been declared elected to the Bengal Assembly from Bakerganj North-East General Constituency against Mr. Saral Kumar Dutta, the former securing 12,069 votes and the latter 10,653 votes.

১৯৩৭-এর ওই নির্বাচনে সমগ্র বাংলাজুড়ে সবচেয়ে চমক সৃষ্টিকারী ঘটনা ছিল বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব সাধারণ এই আসন এবং পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালী আসনের ফলাফল। দ্বিতীয় আসনে লড়ছিলেন তখনকার রাজনীতির প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজা পার্টির ফজলুল হক এবং জমিদার শ্রেণির অন্যতম প্রতিভূ ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর চাচাতো ভাই খাজা নাজিমুদ্দিন। দুটি আসনের ফলাফলই বাংলার রাজনীতিতে দুটি পৃথক বার্তা দেয়। প্রথম আসনের ফল দলিত-তফসিলিদের রাজনৈতিক উত্থানের বার্তা দেয়; দেখা যায় যে বাংলায়

কংগ্রেসের পেছনে আর ব্যাপক হিন্দু সমর্থন নেই। দ্বিতীয় আসনের ফল জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের সাধারণ সমর্থনের কথা জানায়। দুটি বার্তা আবার মিলিতভাবে তফসিলি-মুসলমান ঐক্যের জমিনেরও ইঙ্গিত দেয়।

১৯৩৭-এর ওই নির্বাচনে বাংলায় ২৫০টি আসনের মধ্যে শিডিউল কাস্টরা জিতেছিলেন ৩২টি আসনে। তবে যোগেন মণ্ডল ছাড়া তফসিলিদের বাকি আসনগুলো ছিল সংরক্ষিত আসন। তখনকার ভারতের সব প্রদেশ মিলে একজন মাত্র তফসিলিই সাধারণ আসনে বিজয় অর্জন করেন।[৩৫] এরপর তিনি অনায়াসেই 'মূলধারা'র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হতে পারতেন। সমকালীন রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় কংগ্রেসে প্রবেশই এ সময় তাঁর জন্য স্বাভাবিক ও নিরাপদ ছিল। কিংবা বরিশালেরই ফজলুল হকের সঙ্গী হওয়া তাঁর জন্য সর্বোচ্চ দ্বিতীয় বিকল্প হতে পারত। কিন্তু সেসব না করে যোগেন শূদ্রদের পক্ষে একটা নতুন রাজনীতি নির্মাণ করতে চাইছিলেন বলেই প্রমাণ মেলে। বাঙালি সমাজের 'ছোটলোক'দের নতুন এক রাজনৈতিক সত্তা আকারে হাজির করতে চাইলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। নির্বাচিত এমএলএ হিসেবে তিনি গঠন করলেন 'ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট অ্যাসেম্বলি পার্টি'। এই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন তিনি। তবে এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠছিল শরৎ বসুর সঙ্গে।

১৯৩৭-এর বঙ্গীয় আইনসভা বাংলার প্রথাগত রাজনীতিতে পালাবদলের একটা প্রতীকী সূচনা ঘটিয়েছিল বলা যায়। এই আইনসভার শুরু ১৮৬২-এর জানুয়ারি থেকে। যদিও তখন এর সদস্যরা নির্বাচিত ছিলেন না এবং পরিষদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১২ জন মনোনীত সদস্য (চারজন সরকারি, চারজন বিদেশি এবং চারজন রাজ-অনুগত বেসরকারি নাগরিক) দিয়ে এর যাত্রা শুরু। ১৮৯২-এ এই কাঠামোতে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ২০। তখনো নির্বাচনের বিধান ছিল না। ১৯০৯-এও সদস্যসংখ্যা আবার বাড়ানো হয়। কিন্তু তখনো নির্বাচনের বিষয়টি অনুমোদন করেনি ঔপনিবেশিক শক্তি। সেটা করা হয় ১৯১৯-এ। ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে ১১৪ জনকে জনগণের বাছাইকৃত একটা অংশ কর্তৃক নির্বাচনের বিধান করা হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন যাঁরা ভোটার হতেন, বাংলায় তাঁদের সংখ্যা ছিল এ সময় মাত্র ১৫ লাখ। বস্তুত আইনসভা-ঐতিহ্যের পূর্ববর্তী সাত দশকই প্রতিষ্ঠানটি ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের অনুগত উচ্চশ্রেণির দখলেই ছিল। ১৯৩৭ নাগাদ এই ঐতিহ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা ঘটে ভোটদাতাদের

পরিসর বৃদ্ধি এবং অচ্ছুত যোগেন মণ্ডলের মতো ব্যক্তিদের পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং কৃষক প্রজা পার্টির সামাজিক ইস্যুভিত্তিক রাজনীতির বড় বিজয়ে। তবে এ সময়ও শিক্ষা ও সম্পদের মাপকাঠিতে ভোটার নির্ধারণ প্রক্রিয়া বহাল থাকায় তাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের অধিক ছিল না বলেই ধারণা করা হয়। অর্থাৎ ভোটের প্রক্রিয়া তখনো উচ্চশ্রেণির জন্য ব্যাপকভাবে অনুকূল ছিল। তবে ভোটার হওয়ার শর্ত যত শিথিল হচ্ছিল, ততই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উচ্চশ্রেণির পূর্বতন সুবিধা হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯৪৬ সাল নাগাদ জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ ভোটাধিকার পায়।

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন সফল হিন্দু-তফসিলির স্বাভাবিক গন্তব্য কংগ্রেস হলেও এ সময় সেই চেনা পথ এড়িয়ে ক্রমে মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করার নীতি নিয়েছিলেন যোগেন মণ্ডল। আগেই ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বরিশালে খান বাহাদুর হাসেম আলী খান এবং খান বাহাদুর ইসমাইল চৌধুরীর সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। ওই নির্বাচনে উপরিউক্ত মুসলমান নেতারা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বর্ণহিন্দু নেতারাও কেউ কেউ যোগেনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন *বরিশাল হিতৈষী* সম্পাদক দুর্গামোহন সেন।[৩৬] তবে উপরিউক্ত মুসলমান ও হিন্দু উচ্চবর্গীয়দের সমর্থন সত্ত্বেও যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি ছিল ভিন্ন এবং স্পষ্ট। 'শূদ্র সমাজের জমির আইল যার সঙ্গে রাজনীতি হতে হবে তার সঙ্গেই'—এরূপ এক মনস্তত্ত্ব দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন যোগেন তখন। পূর্ব বাংলার মুসলমান চাষিসমাজকে তিনি শূদ্রের মিত্র হিসেবে দেখতে পাচ্ছিলেন। কংগ্রেস তাঁর কাছে তখন 'বামুন-কায়েত-বৈদ্যদের দল'—প্রতিদিনকার জীবনে যাদের উঠোনেও উঠতে পারতেন না যোগেনের মতো লাখো শূদ্র দলিতরা।

উল্লিখিত রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা থেকেই পরবর্তী সময়ে (১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল) আরও দুই তফসিলিসহ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন যোগেন মণ্ডল। মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলায় তফসিলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপকভিত্তিক মৈত্রী ও সফল দর-কষাকষির শুরুর বিন্দু বলা যায় ১৯৪৩ সালকে। এ সময় সমবায়, ঋণ ও পল্লি দারিদ্র্য বিমোচনবিষয়ক মন্ত্রণালয় দেওয়া হয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। প্রেমহরি বর্মণ এবং পুলিন বিহারী মল্লিক পান যথাক্রমে বন ও আবগারি এবং প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। মুকুন্দ বিহারি মল্লিককে হাউসের ডেপুটি লিডার করা হয়। নাজিমুদ্দিন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ২১ জন প্রাদেশিক তফসিলি সদস্যের

সমর্থনের একটি নির্ধারক ভূমিকা ছিল। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথমবার তফসিলিরা 'প্রেশার গ্রুপ' হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের সঙ্গে মৈত্রীর সূত্রে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দাবি আদায় করে নিয়েছিলেন এ সময় যোগেনের নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র তফসিলি জনপ্রতিনিধিরা। সেগুলো ছিল: মন্ত্রিসভায় অন্তত তিনজন তফসিলিকে নেওয়া; শিক্ষা খাতে শিডিউল কাস্টদের জন্য অন্তত পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ করা এবং সরকারি চাকরির উচ্চতর পদগুলোতে সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগত হিস্যার ভিত্তিতে তফসিলিদের নিয়োগ দেওয়া। এরূপ মৈত্রীর ওপর দাঁড়িয়েই যোগেন মণ্ডল সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায়ও বিচার, পূর্ত ও গৃহনির্মাণমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয় ১৯৪৬-এ পিরোজপুর-পটুয়াখালী কেন্দ্র থেকে তাঁর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হওয়ার ফলে। নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় থাকার সময় যোগেন তফসিলিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে পুরো সরকারের কার্যক্রমে নজর রাখতেন এবং প্রতিনিয়ত এ ক্ষেত্রে দর-কষাকষি করতেন। এর ফলে পুরো বাংলা প্রশাসনে তফসিলিদের বিষয়ে তাঁর একটা আপসহীন ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

কেবল নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় যোগেন মণ্ডল, পুলিন বিহারী মল্লিক ও প্রেমহরি বর্মণের মতো দলিত নেতাদের যোগদানই নয়, ভারতবর্ষজুড়ে কংগ্রেস প্রভাবিত রাজনীতির উত্থানের এই কালপর্বে বাংলায় নমশূদ্র ও তফসিলি চেতনার মতিমুখটি বোঝা সম্ভব ১৯৩৭-এর সময়ের নির্বাচনী তথ্যের বাড়তি বিশ্লেষণ থেকেও। ওই নির্বাচনে ১৩ জন সফল নমশূদ্র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন কংগ্রেস সভ্য এবং এই নির্দল সংসদ সদস্যরা মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। উক্ত নির্বাচন শেষে গঠিত ১৩ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন পুলিন বিহারী মল্লিকের ভাই মুকুন্দ বিহারী মল্লিক।[৩৭] তবে বাংলা সরকারে তফসিলি প্রভাব বিশেষভাবে বাড়ে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর আমলে এসে।

১৯৩৭-পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যখন এরূপ ঘটনা ঘটছিল, তখনই বৃহত্তর ফরিদপুরভিত্তিক দলিত সম্প্রদায়ের আরেক প্রধান সংগঠক গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে। ধারণা করা যায়, গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যু যোগেন মণ্ডলের প্রভাবের পরিসর আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৫-এ বাংলায় তফসিলি ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন হয় গোপালগঞ্জে এবং তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন যোগেন মণ্ডল। ইতিমধ্যে ১৯৪২-এ তফসিলিদের সর্বভারতীয় প্লাটফর্মটি (অল ইন্ডিয়া শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন) গড়ে উঠেছে আম্বেদকরের নেতৃত্বে এবং পরের বছর যোগেন মণ্ডলকে সভাপতি এবং

দিনাজপুরের শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ এবং ময়মনসিংহের মনমোহন দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৯৪৩ সালের মে মাসে বাংলায়ও তার শাখা স্থাপিত হয়ে গেছে। যোগেন মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত *জাগরণ* পত্রিকা অফিসেই (১/২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট) এর নির্বাহী কার্যালয় স্থাপিত হয়।[৩৮]

সুভাষের পর এ পর্যায়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক বন্ধুত্বটি বিকশিত হতে শুরু করে আম্বেদকারের সঙ্গে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পাশাপাশি তৃতীয় একটি রাজনৈতিক ধারা হিসেবে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের। বাংলায় এর প্রথম শাখা গড়ে উঠেছিল ফরিদপুরে। এই অঞ্চলে সংগঠনের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণেই ১৯৪৫ সালের ২৪ ও ২৫ এপ্রিলে গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেসময়ের সর্ববৃহৎ দলিত-নমশূদ্র রাজনৈতিক সমাবেশ, যেখানে সুদূর আসাম থেকেও দলিত-নমশূদ্র প্রতিনিধিরা হাজির হন। এই সমাবেশ উপলক্ষে যে রাজনৈতিক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, তাতে উল্লেখিত আট দফা দাবির প্রথম দফাটি ছিল 'পৃথক রাজনৈতিক অধিকার'-সংক্রান্ত।[৩৯] এই সম্মেলনে যোগেন মণ্ডল সভাপতির যে দীর্ঘ ভাষণটি দেন, তাতে প্রথমবারের মতো তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার বড় ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন এই বলে :

> যে বিধান মানুষে মানুষে পার্থক্য ও ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করে, সে বিধান আর মানিব না। সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলিয়া দিয়া তফসিলি সম্প্রদায়গুলোকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হইবে।[৪০]

# আম্বেদকর-যোগেন মণ্ডল মৈত্রী

১৯৪৩-এ যোগেন মণ্ডলের মুসলিম লীগকে সমর্থন কেবল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতেই ভূমিকম্পতুল্য ঘটনা ছিল না, এটা ভারতের কেন্দ্রভূমিতেও দলিতদের রাজনৈতিক শূন্যাবস্থা থেকে রক্ষা করেছিল। আম্বেদকর যখন স্বাধীনতার উষালগ্নে তাঁর পুরোনো নির্বাচনী এলাকা মহারাষ্ট্র থেকে বোম্বে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে (মার্চ ১৯৪৬) জয়ী হতে ব্যর্থ হলেন (কংগ্রেস ও বামদের কাছে হেরে), তখন যোগেন মণ্ডলের ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৬-এ তাঁকে বঙ্গীয় আইনসভা থেকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়।

যোগেন মণ্ডলের ওই ভূমিকার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবিধান সভায় (গণপরিষদে) আম্বেদকরের উপস্থিতি সুনিশ্চিত এবং ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে আম্বেদকরের বহুল প্রচারিত ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। এ সময় (জুলাই-আগস্ট ১৯৪৬) বিভিন্ন প্রাদেশিক সভার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ২৯৬ সদস্য বাছাইয়ের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধান সভা গড়ে উঠেছিল (এর বাইরে দেশীয় রাজ্যগুলোর কিছু প্রতিনিধিও ছিলেন)।

প্রতি ১০ লাখ ভোটারের বিপরীতে একজন করে প্রতিনিধি বাছাই করা হচ্ছিল সংবিধানসভার জন্য। সে ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদের অন্তত পাঁচজন প্রতিনিধির (এমএলএ) সমর্থন প্রয়োজন ছিল সংবিধান সভায় কারও প্রতিনিধিত্বের জন্য। ২৫০ আসনের মধ্যে ৩০টি আসন ছিল 'শিডিউল কাস্ট' সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলায় তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত এরূপ ৩০টি আসনের মধ্যে ২৬ জনই ছিলেন কংগ্রেস-দলীয় সদস্য। ফলে সেখানে আম্বেদকরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় কঠিন ছিল। উপরন্তু কংগ্রেস তাঁকে রুখতে বদ্ধপরিকর ছিল।

আম্বেদকর বঙ্গীয় আইনসভা থেকে নির্বাচিত না হলে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেতেন কি না সন্দেহ। তাঁকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখতে পারা ছিল আম্বেদকরের জীবনব্যাপী সংগ্রামের এক যৌক্তিক উপসংহার। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যোগেনসহ বাংলার দলিত শ্রেণির দূরদর্শী কয়েকজন প্রতিনিধি।[৪২] ফলে সংবিধান সভায় শেষ পর্যন্ত আম্বেদকরই ছিলেন তফসিলি জাতি ফেডারেশনের একমাত্র প্রার্থী। যোগেন মণ্ডল যদি আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পুনরায় যুক্ত হতে সাহায্য না করতেন, তাহলে আজকের ভারতে দলিতদের জন্য যেসব সাংবিধানিক ও আইনগত সুরক্ষা তৈরি হয়েছে, তার অনেক কিছুই অর্জন সুদূরপরাহত হয়ে যেত।[৪৩] সংবিধানসভায় কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বরাবরই বলছিলেন, ভারতের দলিত নমশূদ্ররা কোনো পৃথক বর্ণ নয়; তারা হিন্দুই। তাদের বঞ্চনার ধরন অর্থনৈতিক। কংগ্রেসই এই বর্গের একমাত্র প্রতিনিধি। এরূপ বক্তব্য আসছিল সংবিধান সভায় যাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করছিলেন (২৯ জন), তাঁদের তরফ থেকেও। কিন্তু আম্বেদকর তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে ভিন্ন চিত্র দেখাতে সক্ষম এবং সংবিধান প্রণয়নেও তার প্রতিফলন ঘটাতে তৎপর ছিলেন। এভাবেই আম্বেদকর-যোগেন মণ্ডল মৈত্রী তখনকার ভারতে তফসিলিদের প্রধান এক রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল।

আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় আনার ক্ষেত্রে যোগেন মণ্ডলের উদ্যোগ কীভাবে কলকাতায় বর্ণহিন্দু নেতৃত্বের বাধার মুখে পড়েছিল, সে বিষয়ে আরও বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আলোচনায়। তবে এ পর্যায়ে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে অন্তত সামাজিক একটি ক্ষেত্রে যোগেন মণ্ডল ও আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বৈপরীত্য ছিল। তা হলো ধর্মান্তকরণ। আম্বেদকর একে বঞ্চনাময় দলিত জীবনের অনিবার্যতা মনে করতেন। 'ধর্ম মানুষের জন্য—ধর্মের জন্য মানুষ নয়। সুতরাং আত্মসম্মানের স্বার্থে প্রয়োজনে ধর্ম পাল্টে ফেলার যৌক্তিকতা রয়েছে'—এটাই ছিল আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে যোগেন একে 'আমাদের জাতির অঙ্গচ্ছেদ' মনে করতেন।[৪৪]

# পুনা চুক্তি, তফসিলি রাজনীতি ও বাংলা ভাগ

যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে আম্বেদকরের রাজনৈতিক মৈত্রী গড়ে ওঠার বড় এক উপলক্ষ ছিল 'পুনা চুক্তি' পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। উপমহাদেশের দলিত সংগ্রামের ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত ঘটনা এটি। এই চুক্তি উপমহাদেশ জুড়ে তফসিলি জাতিগুলোর রাজনৈতিক সম্মিলনকে বেগবান করেছিল। এই চুক্তি হয় আম্বেদকর ও কংগ্রেসের মাঝে দলিতদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে। গান্ধী-নেহরু-বল্লভভাইদের সঙ্গে এ বিষয়ে আম্বেদকর-যোগেন মণ্ডল প্রমুখ একাই যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। দলিত-নমশূদ্রদের পক্ষ থেকে আম্বেদকর চাইছিলেন দলিতদের পৃথক সামাজিক বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করে 'পৃথক ভোট-ব্যবস্থার' মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হোক। যেমনটি সে সময় চাইছিলেন মুসলমান নেতারা তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য। কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করতে ব্যর্থ হলেও দলিতদের অনুরূপ অধিকার দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাঁরা চাইছিলেন মনোনয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে দলিতদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ।

এই বিবাদ মীমাংসার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালের নভেম্বরে 'সাইমন কমিশন' প্রেরণ করে ভারতে। এরপর একই বিষয়ে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে দুটি গোলটেবিল বৈঠক হয়। এ সময় আম্বেদকরের ভূমিকার মধ্য দিয়ে যখন দলিতদের স্বতন্ত্র নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবি প্রায় স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছিল[৫৭], তখনই ১৯৩২-এর ২০ সেপ্টেম্বর গান্ধী পুনার একটি কারাগারে অনশনে বসেন। মৃত্যুপথযাত্রী গান্ধীকে বাঁচানোর জন্য এ সময় আম্বেদকর তাঁর দাবির প্রশ্নে কিছু ছাড় দিয়ে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ৯টি শর্তযুক্ত এক সমঝোতা চুক্তি করেন। 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেছিলেন নির্যাতিত শ্রেণিসমূহের পক্ষে

আম্বেদকর এবং বর্ণহিন্দুদের পক্ষে মদনমোহন মালব্য। এই চুক্তির মূল নির্বাচনী শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

> সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষিত করা হবে। এই আসনগুলোর জন্য নির্বাচন যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। অস্পৃশ্য শ্রেণির যেসব ভোটার সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতে তালিকাভুক্ত হবেন, তাঁদের দ্বারা একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে। উক্ত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেকের একটি করে ভোটের পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুসারে অস্পৃশ্য শ্রেণির চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। এটাকে বলা হবে অস্পৃশ্য শ্রেণির প্রাথমিক নির্বাচন। এভাবে নির্বাচিত চারজন প্রার্থীর মধ্যে একজন সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী (উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ মিলে) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন।

স্পষ্টতই এই চুক্তি তফসিলিদের প্রত্যাশামতো ছিল না। গান্ধী কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আম্বেদকর এই চুক্তি করতে বাধ্য হন মাত্র। তবে এই চুক্তির আলোকেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়। এর আলোকেই উপমহাদেশে অনুন্নত দলিত শ্রেণিগুলোর তালিকা তৈরি হয়। ভারত শাসন আইনের পঞ্চম তফসিলে এরূপ জনগোষ্ঠীগুলোর একটি তালিকা সংযুক্ত হয়। এরাই বর্তমান গ্রন্থে পুনঃপুন উল্লিখিত 'তফসিলি জাতি'। এভাবেই সেদিন উপমহাদেশে নতুন এক রাজনৈতিক বর্গের পরোক্ষ জন্ম হয়। বলা যায়, তারই ফল হিসেবে ১৯৪২ সালের জুলাইয়ে নাগপুরে সারা ভারত তফসিলি জাতি ফেডারেশন গঠিত হয়, যাকে বলা যায় উপমহাদেশের দলিত রাজনীতিতে নিম্নবর্গের হিন্দুদের প্রথম বড় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ। এর মাত্র এক বছরের মধ্যে (১৯৪৩ সালের মে মাসে) নিখিল ভারত তফসিলি ফেডারেশনের বাংলা শাখা গঠিত হয়। যোগেন মণ্ডল এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তফসিলিদের বাংলা শাখার প্রথম সম্মেলন হয়েছিল গোপালগঞ্জে ১৯৪৫ সালের ২৪ ও ২৫ এপ্রিল। আম্বেদকরের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ঘটেনি তফসিলিদেরই একাংশের গোপন কোনো বিরোধিতার কারণে। তবে আম্বেদকর তত দিনে বাংলাতেও তফসিলিদের এক বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন। এই সমাবেশ থেকে বিভিন্ন দাবিদাওয়া-সংবলিত যে লিফলেটটি প্রচারিত হয়, সেটা তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় খুব প্রাগ্রসর ছিল। দাবিদাওয়াগুলোর মধ্যে ছিল :

—জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন;
—জোতদারদের থেকে জমি নিয়ে তা শিডিউল কাস্ট ভূমিহীন চাষিদের মাঝে বণ্টন করা;
—কৃষিপণ্যের যৌক্তিক দাম নির্ধারণ;
—জলাভূমিতে মাছ ধরার অধিকার জেলেদের জন্য সংরক্ষণ;
—সরকারি চাকরিতে শিডিউল কাস্টদের প্রতি বঞ্চনা লাঘবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একজন শিডিউল কাস্ট সদস্য নিয়োগ;
—নগর প্রশাসন ও কারখানায় আইনগত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়া।
—জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক বোঝাপড়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের আট কোটি শিডিউল কাস্টের নেতা হিসেবে আম্বেদকরকে গণ্য করা।[৪৬]

যোগেন মণ্ডল গোপালগঞ্জ সমাবেশে তফসিলিদের একটি 'স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা' হিসেবে হাজির হওয়ার ডাক দেন। অর্থাৎ স্পষ্টতই এত দিন মূলধারায় কেবল যথাযথ 'রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব'-এর দাবি জানালেও এই প্রথম ভারতে এবং বাংলায় দলিতরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়। একই সময় দলিত নেতৃত্ব, বিশেষত আম্বেদকর জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের এই অবস্থানও সমর্থন করেছিলেন যে উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার দাবিকে সমর্থন করে।[৪৭] তাঁর যুক্তি ছিল, যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে গেছে, তাই তাদের কোনো শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচেই আটকে রাখার সুযোগ নেই। এ ছাড়া তিনি মুসলমান ও হিন্দুদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যাগত আধিক্য এবং রাজস্ব অবদানে তাদের পার্থক্যকে রাজনৈতিকভাবে পৃথক হওয়ার দাবির সামাজিক ভিত্তি হিসেবেও তুলে ধরেন। তিনি প্রয়োজনে দেশভাগের সঙ্গে জনসংখ্যার পারস্পরিক স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন।

তবে যোগেন মণ্ডল এ সময় বাংলা ভাগের বিপক্ষে অবস্থান নেন। কারণ, এ সময় বাংলার যে অংশের পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৮০ ভাগই ছিল তফসিলি, যারা ছিল কৃষক ও মৎস্যজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী। এরূপ জনগোষ্ঠী তথাকথিত 'লোক হস্তান্তর কর্মসূচি'র

অধীনে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়ত। যোগেন মণ্ডলের দেশভাগ বিরোধিতার গভীর এক প্রাণপ্রকৃতিগত তাৎপর্যও ছিল। কারণ নমশূদ্র, রাজবংশীসহ প্রধান প্রধান নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের ধারে যার অঞ্চলের সঙ্গে ছিল এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে গবেষক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> Both Rajbansi and Namasudra identities were deeply embedded in their respective regions, the Rajbansis having old tribal ties with the land and a history of regional state formation in North Bengal, and the Namasudras emerging as a peasant community through land reclamations in the eastern Bengal districts since the late nineteeth century.[৪৮]

এ অবস্থায় যোগেন মণ্ডল 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা'র পক্ষে অবস্থান নিলেও বর্ণহিন্দু নেতারা, হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলা ভাগ চাইছিলেন। তাঁরা পরোক্ষে হিন্দু মনোজগতে এরূপ ভয় ছড়াতেও তৎপর ছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ বাংলায় মুসলমান আধিপত্যের কারণে হিন্দু 'দাস'-এ পরিণত হবে।[৪৯] অথচ এই নেতারাই চার দশক পূর্বে 'বঙ্গভঙ্গ'-এর বিপক্ষে ছিলেন এবং 'স্বদেশি আন্দোলন'-এর মাথাতার পক্ষে তখন আবেগমথিত অনেক কবিতা ও গান লিখিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে এসে বাংলা ভাগের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার সময় কংগ্রেস ও মহাসভার নেতৃত্ব এ-ও ভুলে গিয়েছিলেন যে সম্ভাব্য বিভক্ত বাংলার পূর্বাংশের হিন্দুদের কথা তাঁরা বেমালুম অগ্রাহ্য করছেন শুধুই পশ্চিমাংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার রাজনৈতিক অভিলাষের কারণে। এ সময় নোয়াখালীর হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের নিরাপদ করতে আপনারা বাংলা ভাগ করতে চলেছেন, কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আমাদের অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের যে আত্মত্যাগ—তার কী প্রতিদান?'[৫০] আপাত নিরীহ এই প্রশ্ন প্রমাণ করছিল যে 'পার্টিশন' ছিল বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদের পুরো একটা 'অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স'।

এ সময় শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক কংগ্রেস নেতা কেবল বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন। শরৎ বসু প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠি লিখে এটা জানিয়েছিলেন যে বাংলায় হিন্দু মাত্রই প্রদেশের ভাগ চাইছে, এই দাবি বাস্তবসম্মত নয়—অন্তত পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে তো নয়ই। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রদেশের নিম্নবর্গের কথাই

বলেছিলেন।[৩] এরূপ মতামত সত্ত্বেও ১৯৪৭-এর ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (বিপিসিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাগের পক্ষে অবস্থান নেয়। তবে ভারত ভাগের মতোই বাংলা ভাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্থানে ছিল না বাংলার স্থানীয় নেতৃত্ব। সিদ্ধান্ত যা সবই হচ্ছিল ব্রিটিশ শক্তি এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব দ্বারা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে বিভক্তভাবাপন্ন স্থানীয় সংগঠকেরা তৎপর ছিলেন।

১৯৪৭-এর বাংলায় জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব ভেবেছিলেন বাংলা এক থাকলে রাজনৈতিক পরিসরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলে আসবে। এমনকি অখণ্ড বাংলা ভারতের মধ্যে থাকলেও তাতে মুসলমান নেতৃত্ব অবধারিত। এরূপ বিবেচনা থেকেই হিন্দু নেতৃত্বের প্রভাবশালী ধারা বাংলা ভাগের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। জনমত পক্ষে রাখতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা সে সময় প্রদেশজুড়ে অনেক জনসভা আয়োজন এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেছিল।

অন্যদিকে তফসিলি ফেডারেশনের নেতৃত্ব ভেবেছিল প্রায় দেড় কোটি হিন্দুর পক্ষে সে সময় বসতি ছেড়ে অন্যত্র গমন বাস্তবসম্মত নয়। উপরন্তু এর মধ্য দিয়ে তারা সেই পুরোনো বর্ণহিন্দুদের অধীনই হয়ে পড়বে। ১৯৪৭-এর ২১ এপ্রিল দিল্লিতে যোগেন মণ্ডল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করেন এবং পরের মাসে বাংলার মফস্বলজুড়ে একের পর এক দেশভাগবিরোধী সমাবেশ করতে থাকেন। কেবল বরিশাল-ফরিদপুরে নয়, সুদূর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি পর্যন্ত তিনি লাগাতার সমাবেশ করছিলেন। '৪৭-এর ৪ মে দার্জিলিং, ৬ মে জলপাইগুড়ি, ৭ মে দিনাজপুরের তাঁর সভা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সময় তিনি রাজবংশীদেরও দলিত-মুসলমান ঐক্যের রাজনীতি ও অখণ্ড বাংলার ধারণায় দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্তির চেষ্টায় ছিলেন। ১৯৪৭-এর ১২ মে তারিখের বাংলা প্রদেশ শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের এক 'সংবাদ বিজ্ঞপ্তি' থেকে দেখা যায় হুগলিতে যোগেন মণ্ডলের জনসভায় বাগদি, সাঁওতাল, কাওরা, তিয়র, বাউরি ইত্যাদি শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধিরাও ছিলেন। ২৭ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি এই মর্মে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা 'পার্টিশন'-এর বিপক্ষে।

তবে এরূপ সাক্ষ্যও পর্যাপ্ত রয়েছে যে শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের অনেকে বাংলা ভাগ সমর্থনও করছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ছাড়াও প্রেমহরি বর্মণ (সাবেক মন্ত্রী), মনোরঞ্জন দাস (নোয়াখালী), বিরাট চন্দ্র মণ্ডল

সেভাপতি, নিখিল ভারত ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন), রাধানাথ দাস (১৯৪০-এ যাঁর বিরুদ্ধে যোগেন মণ্ডল কলকাতা পৌরসভায় নির্বাচন করেন) প্রমুখ সোচ্চার ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা (এবং আনন্দবাজার পত্রিকাও) তাদের বিশেষ প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা যোগেন মণ্ডলের বক্তব্যকে তফসিলিদের একমাত্র মতামত হিসেবে গণ্য না করার জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের বোঝাতেও সচেষ্ট ছিলেন।[৫২] আবার এরূপ পক্ষ-বিপক্ষীয় মতামত চূড়ান্ত কোনো অবস্থানের পরিচায়কও ছিল না। কারণ, প্রমথ ঠাকুর ১৯৪৭-এর ১৪ মার্চ কলকাতায় নিখিল বঙ্গ নাশনালিস্ট ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে 'ঐক্যবদ্ধ বাংলায় জনগণের সরকার' প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেন।[৫৩] আবার ২৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে পাঠানো অপর এক বিবৃতিতে একই পি আর ঠাকুর যোগেন মণ্ডলকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানান, যা ভারতভুক্ত হবে।[৫৪]

অর্থাৎ এ সময় দলিত-নমশূদ্র নেতাদের বাংলা ভাগ প্রশ্নে বিভিন্নমুখী ও দোদুল্যমান অবস্থান নিতে দেখা যায়। এরূপ দোদুল্যমানতার ভিত্তি ছিল তখনকার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিবিধ প্রতারণা। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এরূপ অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। তবে জুনের পর পরিস্থিতি যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন শিডিউল কাস্টদের প্রতিকূলেই প্রবাহিত হতে শুরু করে। ১৯৪৭-এর ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন 'পার্টিশন প্ল্যান' ঘোষণা করেন। তার আগের দিন ভাইসরয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে যে বৈঠক করেন তাতে 'পার্টিশন' ঠেকাতে মরিয়া যোগেন এ প্রশ্নে বাংলার তফসিলিদের মাঝে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলেও 'বাস্তব প্রস্তুতি না থাকার' কারণে তা অগ্রাহ্য হয়।[৫৫]

ঐতিহাসিক তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে বাংলা ভাগের উপরিউক্ত আয়োজন চলছিল বাংলার জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বিপরীতে দাঁড়িয়েই। গবেষক দ্বৈপায়ন সেনের গবেষণা থেকে দেখা যায়[৫৬], ১৯৪৭-এর ২০ জুন বাংলার আইনসভায় যখন ভোটাভুটির কার্যক্রম চলছিল, তখন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সম্মিলিত এমএলএরা ১২৬-৯০ ভোটে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত এবং ভারত ও পাকিস্তান কোথাও যোগ দিতে হলে পাকিস্তানে যোগ দেওয়া উচিত। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের এমএলএরা পৃথকভাবে বসে যে সিদ্ধান্ত নেন, তাতে ৫৮-২১ ভোটে বাংলা

ভাগের পক্ষে এবং ভারতে যোগ দেওয়ার পক্ষে মত দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার এমএলএরা পৃথকভাবে বসে ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা অখণ্ড রাখা এবং যদি যোগ দিতেই হয় তবে পাকিস্তানে (১০৭-৩৪) যোগ দেওয়ার পক্ষে মত দেন। উল্লিখিত তথ্যগুলোর সারমর্ম থেকে দেখা যায়, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১২৭ জন এমএলএ বাংলার খণ্ডীকরণের বিপক্ষে ছিলেন সেদিন এবং উভয় বাংলা মিলে সর্বোচ্চ ৯৩ জন এমএলএ ভাগের পক্ষে ছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে, তখনকার জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগুরু অংশ বাংলা ভাগের বিপক্ষে থেকেও পরিস্থিতি রুখতে পারেননি কিংবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আর এই ঘটনায় অখণ্ড বাংলায় তফসিলিদের সামাজিক বঞ্চনার ধারাবাহিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রচেষ্টারও সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ বাংলার নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় দিল্লি ও লন্ডনে, তাদের সম্মতি বা অংশগ্রহণ ছাড়াই।

এ সময় তফসিলি নেতৃত্বের একাংশে বাংলার খণ্ডীকরণের বিপক্ষে দাঁড়ানোর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে জিন্নাহর এই আশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে:

এক. নবীন পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্ম বা বর্ণকে নয়, 'নাগরিক' হিসেবে বিবেচনা করবে সকল সদস্যকে।[৩৭]

দুই. পূর্ববঙ্গের তফসিলিদের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় ১০ শতাংশ আসন এবং উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও চাকরির ক্ষেত্রে একই জনগোষ্ঠীর জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে;

তিন. একইভাবে প্রাদেশিক চাকরিতেও ৩০ শতাংশ হারে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

যোগেন মণ্ডলের ধারণা ছিল দেশভাগের পটভূমিতে মুসলিম লীগের এরূপ আশ্বাস একটি বহুজনবাদী সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ধারণাকে ঘিরেই জিন্নাহ ও যোগেন মণ্ডলের সম্পর্ক বিকশিত হয় এবং মুসলিম লীগের মনোনীত হিসেবে ১৯৪৬ সালের ১ মে কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন যোগেন মণ্ডল। এর ঠিক পূর্ববর্তী সময় তিনি বাংলার সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় বিচার, আইন এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণমন্ত্রী ছিলেন।

# 'দাঙ্গা' ও যোগেন মণ্ডলের ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা 'ছোটলোকদের এক হওয়া প্রয়োজন'

সাতচল্লিশ-পূর্ব সময়টিতে যোগেন মণ্ডল একদিকে যখন বাংলায় আম্বেদকরের শিডিউল ফেডারেশনের শাখা করছেন, একই সময়ে দলিত-নমশূদ্রদের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার জন্য প্ররোচিত করছিলেন মুসলমানদের সঙ্গে মিলতে। আরও সরাসরি বললে তাঁর বক্তব্য ছিল 'ছোটলোকদের এক হওয়া প্রয়োজন।' যেকোনো মূল্যে জাতপাতের নিগড় থেকে মুক্তির কৌশল হিসেবেই ছিল তাঁর ওই রাজনৈতিক অবস্থান।

এই অবস্থানের কারণেই তিনি দাঙ্গার দিনগুলোতে বাংলা ঘুরে ঘুরে নিম্নবর্গের মানুষদের দাঙ্গা থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছিলেন এই বলে যে, এই সংঘাত হলো পুরোদস্তুর সম্ভাব্য শাসক এলিটদের শক্তি পরীক্ষার দুষ্টফল; এতে অংশ নিয়ে নিম্নবর্গের কোনো লাভ নেই। এই বক্তব্যসংবলিত দাঙ্গাবিরোধী লিফলেটও প্রচারিত হতে দেখা যায়—মুসলিম লীগের চার এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের চার নেতার স্বাক্ষরে।[৩৮] তাঁরা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, আবুল হাশিম, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রসিকলাল বিশ্বাস, ভোলানাথ বিশ্বাস এবং দ্বারিকানাথ বারুই। নিজ কাগজ *জাগরণ*-এও যোগেন মণ্ডল প্রতি সংখ্যায় এরূপ বার্তাই দিচ্ছিলেন তখন। তাঁর সেদিনকার প্রচারাভিযানের মূল সুর দেবেশ রায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

> শূদ্রের স্বাভাবিক আত্মীয়তা মুসলমানদের সঙ্গে। শূদ্র ও মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট, আয়-ব্যয়, চাষ-আবাদ, মাছ ধরা নৌকা চালানো, সুখ-অসুখ, চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, অসুখ-বিসুখ, টোটকা-টুটকি—সবই একরকম। তাহলে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধলেই শূদ্ররা গিয়ে, বামুন-কায়েতদের লেঠেল হবে কেন?[৩৯]

যোগেন মণ্ডলের এই অবস্থানের মধ্য দিয়েই সাতচল্লিশে বাংলায় দলিত ও মুসলমানদের জোট রাজনীতির প্রধান বর্ম হয়ে ওঠে এবং তারই ফল 'পূর্ব-বাংলা'র পাকিস্তানের অংশ হওয়া। একই সঙ্গে যোগেনের এই ভূমিকা সেদিন নোয়াখালী ছাড়া প্রায় পুরো পূর্ববঙ্গে দলিত নমশূদ্রদের দাঙ্গার উত্তাপ থেকে অনেকাংশে রক্ষা করেছিল। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' থেকে শুরু হওয়া সেই দাঙ্গা দেশভাগের অন্যতম নির্ধারক ঘটনা ছিল।[৮০] সেদিন কলকাতায় মুসলিম লীগ যে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল, তাতে যোগেন মণ্ডলের সমর্থন ছিল। তবে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন এ সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ইস্যুতে সক্রিয় ছিল। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর আগের দিন ১৫ আগস্ট তারা কলকাতায় পুনা চুক্তিবিরোধী দিবস পালন করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দাঙ্গার ফলে ফেডারেশনের সেই আন্দোলন ইতিহাসের মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। এর ঠিক এক মাস পর গঠিত হয় পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার, যাতে নমশূদ্র যোগেন মণ্ডল ছিলেন মুসলিম লীগের একজন প্রতিনিধি।[৮১]

ইতিমধ্যে কলকাতা হত্যাযজ্ঞের পর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে এক ভোটাভুটি আয়োজিত হলে মুখ্যত যোগেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই কংগ্রেসপন্থী চারজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সদস্য এবং চারজন অস্পৃশ্য সদস্যের সমর্থন মুসলিম লীগের পক্ষে আসে, যা মন্ত্রিসভার পতন রোধ করে। কিন্তু সরকারকে রক্ষা করা গেলেও সমগ্র বাংলাজুড়ে কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা আন্তসাম্প্রদায়িক সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি করে, তা সামাল দেওয়া একজন যোগেন মণ্ডলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বপ্নের সামনে অভূতপূর্ব এক চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় এ সময়।

যদিও দেশভাগের ইতিহাসের মতোই ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় আহত-নিহতদের পরিচয় ও সংখ্যা সর্বত্রই 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' হিসেবেই নথিবদ্ধ হয়েছে—কিন্তু বস্তিবাসী অনেক শ্রমজীবী দলিতও মারা গিয়েছিল কলকাতায়। এই দাঙ্গার সবচেয়ে বিধ্বংসী ফল হয়েছিল বাংলার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে দাঙ্গা-পরবর্তী দিনগুলোতে মুসলমান নিম্নবিত্তদের সঙ্গে হিন্দু নিম্নবর্গের সম্পর্কের অদৃষ্টপূর্ব অবনতি। ক্রমে এই দুই জনগোষ্ঠী পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করে। অতীতে যা ছিল না। উপরন্তু এই প্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির আদলে বাংলায় দলিত-নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমান নিম্নবর্গের সম্পর্ক হিন্দু বনাম মুসলমান সমীকরণে মেরুকৃত হতে শুরু করে।

হিন্দু নেতৃত্বের অনেকেই এ সময় সরকার থেকে পুনঃপুন যোগেন্দ্রনাথের পদত্যাগের দাবি তুলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল এবং তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় না। এর উত্তর দিতে গিয়ে জাগরণ কাগজে যোগেন মণ্ডল যে বিবৃতি[৬২] দেন, তার সারকথা ছিল 'এই দাঙ্গা কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, এটা হলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার রাজনৈতিক যুদ্ধ। এই দাঙ্গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলিতদের অর্জন করার মতো কিছু নেই। পূর্বের মতোই তারা উভয়ে একই আর্থসামাজিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে।' এই বক্তব্য এই অর্থে সঠিক ছিল যে কলকাতায় ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট ও পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনাবলিতে স্বতঃস্ফূর্ততার পরিবর্তে সুসংগঠিত রাজনৈতিক ক্রোধান্ধতাই যে অধিক কাজ করেছিল সে বিষয়ে ইতিমধ্যে বিস্তর অনুসন্ধানী গবেষণা হয়েছে। উল্লিখিত বাস্তবতায় যোগেন মণ্ডল ও তফসিলিদের মৈত্রীর রাজনীতি সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল, মৃত্যুর বিভীষিকা ছাড়াও দাঙ্গায় পুড়েছিল মুসলমান ও দলিতদের বিপুল সম্পত্তি ও বসতি। যোগেন্দ্রনাথের আহ্বান সত্ত্বেও কলকাতা দাঙ্গায় দলিত-নমশূদ্ররা অংশ নিয়েছিল এবং মুসলমানদের মতোই ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছিল। এই পরিস্থিতি স্পষ্টত তখন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বাংলা ভাগের মতাদর্শকেই নৈতিকভাবে শক্তি জুগিয়েছিল, যোগেনের বহুজনবাদকে নয়।[৬৩]

তবে এই প্রসঙ্গে এ-ও উল্লেখ করতে হয় যে ১৬ আগস্টের কর্মসূচি পালনকালে ঢাকার পরিস্থিতি ছিল কলকাতার পরিস্থিতির বিপরীত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ঢাকাস্থ সদর দপ্তর ১৫০ নং মোগলটুলী এবং চকবাজার এলাকা থেকে প্রধান মিছিল বেরিয়েছিল। জনসভার স্থান নির্ধারিত হয়েছিল নয়াবাজার সিরাজউদ্দৌলা পার্কে। মিছিল ও জনসভা উভয়ই শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছিল। সেদিনের স্মৃতিচারণ করে ওই মিছিল ও জনসভার অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ তোয়াহা লিখেছেন, 'রাতে যখন কলকাতা থেকে রক্তপাতের খবর আসতে থাকে, তখনি কেবল ঢাকার আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।'[৬৪]

# বাংলার দলিত-নমশূদ্র আন্দোলনে বিভক্তি

দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত বাংলার পক্ষে অবস্থান নিয়ে যোগেন মণ্ডল চূড়ান্তভাবে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বিরাগভাজন হন। আবার বাংলা ভাগ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তফসিলিদের পূর্ব বাংলায়ই থেকে যাওয়ার পক্ষে প্রচার আন্দোলনে নেমে সেসব নমশূদ্র নেতৃত্বেরও অসন্তুষ্টির কারণ হন, যাঁরা ভারতে চলে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। স্পষ্টত তফসিলি সমাজের সংগঠকদের পূর্বতন মতদ্বৈধতা এ পর্যায়ে এসে বাড়তি তীব্রতা পায়। হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস বহুকাল যাবৎ বাংলায় তফসিলিদের মাঝে বিভক্তির যে চেষ্টা করছিল, এ পর্যায়ে এসে তারা সফল হয়। দলিত-নমশূদ্র নেতৃত্বের এই বিভক্তির পটভূমি ও নীতিগত দিকটি নিয়ে 'পুনা চুক্তি, তফসিলি রাজনীতি ও ভারত ভাগ' অধ্যায়ে ইতিমধ্যে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ সরকারে বাংলার তফসিলি সমাজের নেতাদের প্রভাবশালী একাংশের সমর্থন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তিক্ততার সঙ্গেই নিয়েছিল। তারা এই মৈত্রী অবসানের লক্ষ্যে এবং দলিতনমশূদ্রদের অপরাংশকে কাছে টানতে এরপর ধারাবাহিকভাবে অনেক পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন স্থানে নিম্নবর্গের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশ সুগম করতে 'সত্যাগ্রহ'-এ অংশগ্রহণ, তফসিলি নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকের আয়োজন, শুমারিতে তফসিলি পরিচয়ের পরিবর্তে 'হিন্দু' পরিচয় উল্লেখে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। ১৯৩১ সালে হিন্দু মহাসভা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে উচ্চশ্রেণির নাম গ্রহণ এবং শুমারিকালে 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যাপকভাবে প্ররোচিত করছিল। প্রায় অনুরূপ লক্ষ্যে ১৯৩২-এর এপ্রিলে সমগ্র বাংলা প্রদেশে আয়োজিত হয় হিন্দুমেলা। এর লক্ষ্য ছিল মূলত নিম্নশ্রেণির সদস্যদের 'শুদ্ধ' করে তাদের হিন্দু হিসেবে অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করা।[৩৮] সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় না। ১৯৪১-এর শুমারি প্রকাশিত

হলে দেখা যায়, তাতে পূর্বের শুমারির (১৯৩১) চেয়ে বাংলায় তফসিলি জনসংখ্যা প্রায় ৮ লাখ কমে গেছে, যা ছিল স্পষ্টতই অস্বাভাবিক।

হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক ও সামাজিক সব প্রচারণা উদ্যোগ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয় প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ-তফসিলি জোট সরকারের অভ্যন্তরে তফসিলি নেতৃত্বের অসন্তোষ তৈরি হলে। এই পটভূমিতেই ১৯৩৭ সালের মার্চে ফরিদপুরের নমশূদ্র সংগঠক গুরুচাঁদ ঠাকুর মারা যাওয়ার পর যিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, সেই প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র[৬৬]) ক্রমে ফরিদপুরকেন্দ্রিক নমশূদ্র আন্দোলনের ধারাকে কংগ্রেসমুখী করে তোলেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ মার্চ কলকাতায় মোহন দাস গান্ধীর সঙ্গে দেখাও করেন প্রমথরঞ্জন। এ সময় যোগেন মণ্ডলও উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি তখন সুভাষ বসু। কলকাতা বৈঠকে দলিতদের স্বার্থে গান্ধীর বিভিন্ন আশ্বাসে প্রমথরঞ্জন ধীরে ধীরে অনুকূল সাড়া দিলেও যোগেন মণ্ডলের অবস্থান তদ্রূপ ছিল না। সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ, গান্ধীর 'হরিজন আন্দোলন'কে যোগেন মণ্ডল 'আসল সমস্যা এড়াবার কৌশল' এবং তফসিলিদের জন্য অপমানকর মনে করতেন।[৬৭] যোগেনের এই মনোভাব ছিল প্রকাশ্য। ফলে তফসিলি রাজনীতিতে কংগ্রেসপন্থী এবং ফেডারেশনপন্থী[৬৮] নামে দুটি ধারা তৈরি হয়েছিল। এটা ব্যাপকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর দেশভাগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী ও যোগেন মণ্ডলের 'স্বাধীন সংযুক্ত বাংলা'র প্রস্তাবের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ভিন্ন প্রস্তাব দেন।

১৯৩৯-এর ২৯ মে নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলনে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর সভাপতির ভাষণে তাঁর সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান।[৬৯] কিন্তু যোগেন মণ্ডল স্পষ্টতই স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর গঠিত মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিনের কেবিনেটে তিনি যোগ দেন। ১৯৪৬ সালের সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায়ও তিনি সদস্য হন। এই মন্ত্রিসভাই ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রিসভা। যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরদের এই পৃথক পথচলার চূড়ান্ত রূপ দেখব আমরা ১৯৪৭-পরবর্তী দশকগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষ করে যোগেন মণ্ডল করাচি থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর। সেই বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'ভারতে "বিশ্বাসঘাতক" যোগেন মণ্ডল : "বহুজন রাজনীতি" পুনর্গঠন-চেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায়ে।

# সিলেট গণভোটে যোগেন মণ্ডল

বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদী রাজনৈতিক অবস্থানের একটা পর্যায় শেষ হয়। বস্তুত এটা ছিল একধরনের ঐতিহাসিক ব্যর্থতাই। যে ব্যর্থতার কুশীলব ছিলেন তখন ভারতবর্ষের প্রধান দলগুলোর পাশাপাশি তফসিলি নেতৃত্বের একাংশও। ইতিহাসের নবতর পর্যায়ে যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের পরিসরে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নামেন। সিলেটের গণভোট প্রচারণায় অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এই নবপর্যায়ের শুরু বলা যায়।

বর্তমান সিলেট যে প্রথমে পাকিস্তানে এবং পরে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হলো, তার কৃতিত্বের বড় এক ভাগীদার যোগেন মণ্ডলও। যদিও তা কমই উল্লেখিত হয়। অমুসলিম প্রদেশ আসামে মোট জনসংখ্যার (১,০২,০৪,৭৩৩) মধ্যে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু (৩৪,৪২,৪৭৯)। প্রদেশের সিলেট অঞ্চলই স্বল্পমাত্রায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কংগ্রেস সরকারের অধীনে থাকাবস্থায় ১৯৪৭-এর (৬ ও ৭ জুলাই) গণভোটে সিলেট যে আসাম প্রদেশ ছেড়ে পাকিস্তানভুক্ত হয়, তাতে যোগেন মণ্ডলের প্রচারণা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে দাবি করেছেন ওই নির্বাচনী প্রচারণার সরাসরি কর্মী আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রসূন কান্তি-বরুণ রায়, নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী প্রমুখ। সোহরাওয়ার্দীও এই প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে টাঙ্গাইলের আর পি সাহা কয়েকটি লঞ্চ দিয়ে এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রচারণাকে সহায়তা করেন।[৭০] গণভোটে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছিল ভারতভুক্তির পক্ষে কুঁড়েঘর এবং পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে কুড়াল। কংগ্রেস ও জমিয়েতে উলামায়ে হিন্দ কুঁড়েঘরের পক্ষে কাজ করেছিল। চা-শ্রমিকদের 'ভাসমান জনগোষ্ঠী' অভিহিত করে নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তবে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের অবস্থানের প্রতি মৌন সমর্থন দিয়েছিল।[৭১] যদিও

মাত্র তিন বছর পূর্বেই কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী এবং *পিপলস ওয়ার* পত্রিকার সম্পাদক ডা. গঙ্গাধর অধিকারী *পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটি* নামক এক পুস্তিকায় পাকিস্তান দাবিকে নীতিগতভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং এটাই ছিল তখনকার পার্টির 'রাজনৈতিক লাইন'। মুসলিম লীগের বাইরে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল একমাত্র দল, যারা পাকিস্তান দাবি সমর্থন করেছিল। তবে তিন বছর পর 'যোশী-অধিকারী থিসিস' 'সংশোধন' করতে গিয়ে দলটিকে সিলেট গণভোটকালে বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়।

জিন্নাহর অনুরোধে এই সময় যোগেন মণ্ডল সিলেট গণভোটের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানকার নমশূদ্র ও অন্য দলিতদের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে প্রভাবিত করেন।[৭২] তফসিলি এবং হিন্দু প্রতিপক্ষদের কাছে যোগেন মণ্ডল তখন 'যোগেন মোল্লা' নামে উল্লেখিত হচ্ছিলেন। ইতিহাসের ওই মুহূর্তে নিজের শূদ্রত্বকে যোগেন মণ্ডল অসাধারণ এক রাজনৈতিক মাহাত্ম্যে স্থাপন করতে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ইতিহাসের বড় কৌতুক এই যে যোগেন মণ্ডল যখন সিলেটের পূর্ব-পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন তখন প্রভাবশালী মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর নেতা) সিলেটের আসামভুক্তি তথা ভারতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুড়ালের পক্ষে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৯ ভোট পড়ে এবং কুঁড়েঘরের পক্ষে পড়ে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৪১ ভোট। কুড়াল ৫৫ হাজার ৫৭৮ ভোটে জয়লাভ করে।[৭৩] কুড়ালের পক্ষের অমুসলিম ভোটারদের বিরাট অংশই ছিল স্থানীয় তফসিলিরা এবং এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গণভোট শেষে সিলেটে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়নি। পরবর্তী সময়ে যদিও অনেক হিন্দু পরিবার সিলেট ছেড়েছিল, কিন্তু এমন উদাহরণও বিপুল যে প্রগতিশীল হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং মাতৃভূমিতে থেকে যাওয়ার প্রশ্নে দৃঢ় ছিলেন এবং এ বিষয়ে সিলেটজুড়ে প্রচার আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সিলেট গণভোটকালে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই মূলত মুসলমানদের ভোট প্রার্থনা করলেও যোগেন মণ্ডল যেমন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন, তেমনি ব্যতিক্রম ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। তিনি বিবৃতি দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ভোট চেয়েছিলেন। ভোটের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। তাঁর ওই সময়কার একটি বিবৃতির অংশবিশেষ ছিল এ রকম :

পাকিস্তানে প্রত্যেক মজলুম শোষণের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।...গণভোটের সময় সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি। অনেকেই পাকিস্তান সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের মনে ভুল ধারণা জন্মাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। আমি প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে তাহারা পাকিস্তানে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।[৭৪]

বলা বাহুল্য, এটা ছিল অনেকটাই জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিধ্বনি। তবে ইতিহাসের বড় কৌতুক হলো জিন্নাহর মৃত্যুর পর উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে যাওয়ার কারণে পূর্ব বাংলায় যাদের সঙ্গে মুসলিম লীগের প্রথম দ্বৈধতা তৈরি হয়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ভাসানী ও যোগেন মণ্ডল। ১৯৪৮-এ জিন্নাহর মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে ভাসানী প্রাদেশিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। সরকার এ সময় ১৯৫০ পর্যন্ত ভাসানীর যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ১৯৫০-এই যোগেন মণ্ডলও পাকিস্তান ছাড়েন।

সিলেট গণভোট এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় বিপুল অবদান রাখা সত্ত্বেও জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের একদল দক্ষিণপন্থী আমলা যোগেন মণ্ডলসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন নমশূদ্রদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁদের পাকিস্তানবাস অসহ্য করে তুলেছিলেন এবং বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রভাবশালী আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের এই কর্মকর্তা ১৯৪৭-পরবর্তী দিনগুলোতে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের প্রধান নির্মাতা হয়ে ওঠেন। মন্ত্রিপরিষদের সচিব হিসেবে[৭৫] তিনি অনেক প্রয়োজনীয় নথি আইনমন্ত্রী যোগেন মণ্ডলের কাছে গোপন রাখতেন। তাঁর কাছে যোগেন মণ্ডলের দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এটা ছিল যোগেন মণ্ডলের জন্য চরম হতাশাজনক ও বেদনাময়।[৭৬] যে দেশ প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন, সেখানে ধর্মগত কারণে তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠাকে যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরাজয় হিসেবে অভিহিত করা যায়। সম্ভবত সে কারণেই তিনি পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে আবেগতাড়িত হয়ে পদত্যাগপত্রে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'পাকিস্তান, হিন্দুদের জন্য অভিশাপ।'

# যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রতিক্রিয়া

প্রথমে কংগ্রেস, এরপর স্বতন্ত্র অবস্থান, তারপর আম্বেদকরের সঙ্গে তফসিলি জাতি ফেডারেশন গঠন এবং সবশেষে মুসলিম লীগের সঙ্গে মৈত্রীর রাজনীতি নিয়ে যোগেন মণ্ডলের ধারাবাহিক পদক্ষেপের পুরো সময়টিতে তাঁকে মাঠপর্যায়ে প্রধানত মোকাবিলা করতে হচ্ছিল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে। এরূপ মোকাবিলায় প্রতিপক্ষ কত ক্রুব্ধ ছিল, তা বোঝা সম্ভব কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার জন্য প্রতিনিধিত্ব বাছাইকালে বঙ্গীয় পরিষদে আম্বেদকরকে সমর্থনকারী এমএলএকে আটকে রাখার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। বল্লভভাই প্যাটেল এ সময় প্রকাশ্যেই বলছিলেন, 'দরজা তো দূরের কথা "সংবিধান সভা"র কোনো জানালাও আম্বেদকরের জন্য খোলা রাখা হবে না। আমরা দেখব সে কীভাবে সংবিধান সভায় আসে।'"[৭৭] যোগেন মণ্ডল এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলেন।

আম্বেদকরের প্রতি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার আক্রোশের মূল কারণটি ছিল '১৯৩০-৩২-এর গোলটেবিল'কালে দলিতদের জন্য পৃথক ভোট ও পৃথক জনপ্রতিনিধিত্বের দাবি তোলা। মুসলিম লীগও এ সময় মুসলমানদের জন্য অনুরূপ দাবি তোলে। দলিত ও মুসলমানের এরূপ সমধর্মী অবস্থান কংগ্রেসকে ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলে এবং তার রাজনৈতিক প্রভাবের একচেটিয়াত্ব খর্ব হয় তাতে। ফলে একদিকে জিন্নাহকে মোকাবিলা এবং একই সঙ্গে অন্যদিকে আম্বেদকর-যোগেনদের মোকাবিলাকে কংগ্রেস কৌশল হিসেবে নিয়েছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় পরিষদের সাতজন সদস্য কংগ্রেসের প্রার্থী কিরণ শংকর রায়ের বিপরীতে আম্বেদকরকে সমর্থন করেন, যাঁদের মধ্যে চারজন

ছিলেন নমশূদ্র, দুজন রাজবংশী এবং একজন ট্রাইবাল সদস্য। এঁরা হলেন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন, বরিশাল), মুকুন্দ বিহারী মল্লিক (স্বতন্ত্র, খুলনা), দ্বারিকানাথ বারুরী (কংগ্রেস, ফরিদপুর), গয়ানাথ বিশ্বাস (কংগ্রেস, টাঙ্গাইল), নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (রাজবংশী, স্বতন্ত্র, রংপুর), ক্ষেত্রনাথ সিংহ (রাজবংশী, কংগ্রেস, রংপুর) এবং বীর বিরসা (ট্রাইবাল, কংগ্রেস, মুর্শিদাবাদ)।[৭৮] যাকে কংগ্রেস ভোটদানে বিরত রাখার জন্য আটকে রেখেছিল, সেই গয়ানাথ বিশ্বাসকেও প্রয়োজনের সময় উদ্ধার করা হয়েছিল। সংবিধান সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির দিক থেকে আম্বেদকর ছিলেন এগিয়ে। সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাই শরৎ বসুর মতো খ্যাতনামা নেতাও সমর্থন পেয়েছিলেন মাত্র ছয়জনের। ১৯৪৬-এর ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত ওই ভোটে আম্বেদকরের পক্ষে সর্বোচ্চসংখ্যক সমর্থন নিশ্চিত হয়েছিল মূলত যোগেন মণ্ডলের সাহসী উদ্যোগের ফলে। উল্লেখ্য, ১৯৪০-এ একবার বসু পরিবারের সহযোগিতাতেই যোগেন মণ্ডল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির তিন নম্বর ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনে কাউন্সিলর হন। সে সময় সুভাষচন্দ্র বসু স্বনামে লিফলেট দিয়ে যোগেনের বিজয় নিশ্চিত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন।[৭৯] প্রার্থী হিসেবে কলকাতাবাসী করদাতাদের কাছে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত হলেও ৭০ জন নির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে যোগেন মণ্ডল ভোটপ্রাপ্তির হিসাবে চতুর্থ অবস্থানে ছিলেন। এটা অনেকাংশে বসু পরিবারের কৃতিত্ব হলেও আম্বেদকরের নির্বাচনী প্রশ্নে এসে যোগেন মণ্ডল পুরোনো সেই সম্পর্কের চেয়েও দলিত রাজনীতির ভবিষ্যৎ প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কলকাতার ওই নির্বাচনী রাজনীতিতে সম্পৃক্তি ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে যোগেন জাতীয় পরিসরে বাংলার তফসিলিদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে উপস্থাপনের বিরাট এক সুযোগ পান।

তবে উল্লিখিত সুযোগ সত্ত্বেও যোগেন মণ্ডল দেশভাগ-পূর্ববর্তী চূড়ান্ত নির্বাচনী যুদ্ধে তফসিলি ফেডারেশনের পক্ষে সফল নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন বলা যায় না। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস বাংলায় তফসিলি প্রতিনিধিত্বের পরিসর অনেকখানি অধিকার করে নেয়। ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ২৬টিতেই তারা জয়লাভ করে। স্বতন্ত্র হিসেবে তিনজন নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তফসিলি ফেডারেশন থেকে যোগেন মণ্ডল ছাড়া আর কেউ নির্বাচিত হতে পারেননি। যোগেন মণ্ডল এই নির্বাচনে দুটি আসন থেকে প্রার্থী হয়ে একটিতে পরাজিত হন। এর মধ্যে বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ আসনটি

ছিল সংরক্ষিত এবং বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব আসনটি ছিল সাধারণ। শেষোক্ত এই আসন থেকেই ১৯৩৭-এর নির্বাচনে জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার তিনি তাঁর পুরোনো আসনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোরঞ্জন গুপ্তের বিপরীতে বিজয়ী হতে ব্যর্থ হন। মনোরঞ্জন গুপ্ত ছিলেন একজন সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামী। প্রায় ২৪ বছর কারাগারে ছিলেন তিনি এবং নির্বাচনও করেন কারাগারে থাকাবস্থায়। ফলে তাঁর প্রতি সর্বমহলে বিশেষ সহানুভূতি কাজ করছিল। উপরন্তু দুই আসনে নির্বাচন করার মতো সময় ও অর্থের অভাব ছিল যোগেন মণ্ডলের। এ ছাড়া কংগ্রেস যেকোনো মূল্যে যোগেন মণ্ডলকে হারানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ, তিনি অন্তত দুই কারণে 'অপরাধী' ছিলেন তখন তাদের কাছে। প্রথমত, কংগ্রেস থাকার পরও নিখিল ভারত শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হওয়া; এবং দ্বিতীয়ত, বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারকে সমর্থন দান। এই দুই অপরাধে কংগ্রেস যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে যোগেন মণ্ডল ও তাঁর সমর্থকদের কোণঠাসা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।[৩০]

পরাধীন উপমহাদেশের এই শেষ নির্বাচনে তফসিলিদের সামগ্রিক ফল বিপর্যয়কে অতি তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এর তাৎক্ষণিক ফল হয়েছিল, নিম্নবর্গের সম্ভাব্য মতামত অবজ্ঞা করে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ-ব্রিটেন এই ত্রয়ীই 'স্বাধীনতা'র ধরন নির্ধারিত করে দিতে পারছিল। এরপর থেকে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনকে দলিত-নমশূদ্রদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে মানতে অস্বীকার করে ব্রিটিশ শক্তি। এটা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্যও সুবিধাজনক হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বিহারের জগজ্জীবন রামকে তাদের তরফ থেকে তফসিলি প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করে।[৩১] যদিও একই সরকারে তফসিলি যোগেন্দ্রনাথও ছিলেন। বাংলায় তফসিলিদের ১৯৪৬-এর নির্বাচনী বিপর্যয় যতটা না ছিল যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক চিন্তার অকার্যকারিতা, তার চেয়েও অধিক ছিল পুনা চুক্তির প্রভাব এবং মুসলিম লীগ সরকারের একাংশের সাম্প্রদায়িক অবস্থানজনিত।

পুনা চুক্তির মধ্য দিয়ে তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে প্রথমে তফসিলিদের ভোটে তাদের প্রার্থী বাছাই এবং পরে সেই প্রার্থীদের সাধারণ হিন্দু ও তফসিলিদের যৌথ ভোটে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা করা হয়, তার পুরো সুবিধা ভোগ করে কংগ্রেস। দেখা গেছে, ৩০টি সংরক্ষিত

আসনের প্রথম দফা ভোটে অংশ নেওয়া মাত্র ২৯ জন ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে বিজয়ী ৭৫ জনের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন কংগ্রেসের। আবার এই ২৫ জনের ২৪ জনই উচ্চবর্ণ ও তফসিলি মিলিত চূড়ান্ত ভোটে বিজয়ী হয়ে যান। এ থেকে প্রমাণিত হয়, পুনা চুক্তিতে তফসিলিদের পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে মিলে যে যৌথ ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা কংগ্রেসের পক্ষে এবং তফসিলিদের বিপক্ষে গিয়েছিল। বস্তুত ১৯৪৬-৪৭-এর বহুমাত্রিক টানাপোড়েনকালে গান্ধী ও কংগ্রেসের কাছে এটা ছিল আম্বেদকরের বিশাল এক রাজনৈতিক পরাজয়।[৮২] পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা হলে কংগ্রেস যা করতে পারত না, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় তা-ই করে তারা। সামাজিক প্রভাব খাটিয়ে তফসিলি ফেডারেশনের প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের প্রচারকাজে এবং ভোটের দিন কোণঠাসা করে ফেলেছিল হিন্দু জমিদার ও তালুকদারদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা। এভাবেই 'জয়েন্ট ইলেকটোরেট' (Joint Electorates) ব্যবস্থাটি নিয়মতান্ত্রিক পথে তফসিলিদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উত্থানের গতি রুদ্ধ করেছিল সেদিন।[৮৩]

তবে ১৯৪৬-এর নির্বাচনপূর্ব সময়ে তফসিলি ফেডারেশনের সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টিও অস্বীকার করা যায় না। সংরক্ষিত ৩০টি আসনের নির্বাচনে এই দল মাত্র সাতটিতে প্রার্থী দিতে পেরেছিল। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে তাদের সমর্থিত 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র প্রার্থী ছিল আরও ৫ জন। অর্থাৎ ৩০টি আসনের মধ্যে মাত্র ১২টিতে তফসিলি ফেডারেশনের প্রার্থী ছিল নির্বাচনে। বাকি আসনগুলোতে (১৮টি) দেখা গেছে ১৫ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। এরূপ প্রার্থীরা অধিকাংশই ছিলেন বাংলার পশ্চিম অংশের। যেখানে তফসিলি ফেডারেশন তার সাংগঠনিক ভিত্তি প্রসারিত করার সুযোগ পায়নি। তবে এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৬-এর নির্বাচনী ফলকে ভিত্তি করে কংগ্রেসকে দলিত-নমশূদ্রদের প্রতিনিধি ধরে নেওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। কারণ, যেসব আসনে ভোট হয়েছিল, সেখানে অকংগ্রেসি তফসিলি প্রার্থীরাই সম্মিলিতভাবে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এরূপ প্রার্থীদের (অনেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র) মাঝে অকংগ্রেসি ভোট বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণেই কংগ্রেস 'বিজয়ী' হতে পেরেছিল। কংগ্রেসবিরোধী তফসিলি প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা নিঃসন্দেহে যোগেন মণ্ডল ও তফসিলি ফেডারেশনের বড় এক সাংগঠনিক ব্যর্থতা।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে তফসিলি ফেডারেশনের খারাপ ফলের আরেকটি কারণ ছিল প্রশাসনিক। মুসলিম লীগ সরকারের অনেক ব্যর্থতার দায়ভার বইতে হচ্ছিল সে সময় (পূর্ববর্তী) মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হিসেবে যোগেন মণ্ডল ও তাঁর অনুসারীদের। এ থেকে লাভবান হচ্ছিল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার উচ্চবর্ণীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এ সময় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার অঘোষিত জোটের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। শেষোক্ত দুটি সংগঠন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছে বাংলার নমশূদ্র ও অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় দলিতদের মাঝে মুসলমান নিম্নবর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীর চেয়ে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুত্বের বোধ বেশি মাত্রায় জাগিয়ে তুলতে। ড. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ১৯৩৯-৪০ সাল থেকে তফসিলি জাতিভুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করতে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে মহাসভা। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের বাকেরগঞ্জ জেলায় এদের ৬৫টি, ঢাকায় ৫০টি, ফরিদপুরে ৪৩টি, যশোরে ২৯টি এবং খুলনায় ৩১টি গ্রামীণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এ সময় হিন্দু মহাসভার সভাধিপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর মহাসভার এসব সুসংবদ্ধ প্রয়াসেরই দীর্ঘমেয়াদি ফল হয়েছিল—পরবর্তীকালে তাদের শাখা এলাকাগুলোতে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গার ঘটনা। দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকাগুলোতে অপরাধীদের স্লোগানও ছিল লক্ষণীয়। একদল স্লোগান দিচ্ছিল 'হিন্দুশক্তি কি জয়' বা 'শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ', আর অন্য দল স্লোগান দিচ্ছিল 'মুসলমান জিন্দাবাদ', 'শ্যামাপ্রসাদ ধ্বংস হোক'।[৮৪]

তবে হিন্দু মহাসভার আবির্ভাবের ফল দক্ষিণ বাংলায় কেবল দাঙ্গার ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকল না। দেশভাগ এবং বাংলা ভাগকালে তারা বাকেরগঞ্জ-ফরিদপুর-খুলনা অঞ্চলে পূর্ব বাংলার বাঙালি হিন্দুদের জন্য নতুন আরেকটি পৃথক রাজ্য গঠন এবং সেই রাজ্য ভারতে অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলে। আম্বেদকরের নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তী ঘটনাবলিতে যোগেন মণ্ডল ও শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ অবস্থানের কারণে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস বাংলা ভাগের পক্ষ নিয়েছিল।[৮৫] আর নতুন আরেকটি রাজ্য গঠনের দাবিটি ছিল তার অতিরিক্ত। ইতিহাসের এই পর্বটিতে শরৎ বসু এবং মুসলিম লীগের হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গোষ্ঠীর পাশাপাশি নমশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডল—সংযুক্ত স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবকে সমর্থন করতে থাকেন।

'৪৭-পূর্ব এই সময়ে দক্ষিণ বাংলায় হিন্দু মহাসভার সাংগঠনিক রাজনীতির আরেকটি প্রভাব ছিল শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষয়। যেসব এলাকায় মুসলমান জোতদারেরা সংখ্যা ও শক্তিতে শক্তিশালী ছিল, সেখানে মহাসভাকর্মীরা আদিবাসী শ্রমিক ও ভাগচাষিদের মুসলমানদের জমিতে কাজ না করার জন্য প্ররোচিত করেছিল ধারাবাহিকভাবে।[৮৬] তাদের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেক শ্রমিক মুসলমানদের জমিতে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এটা বিশেষ করে উত্তর বাংলার জেলাগুলোতে ধর্মনির্বিশেষে ভাগচাষিদের মাঝে সংগঠন করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান পরিচয়নির্বিশেষে দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে আগ্রহী কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো এ সময় দেখে, তাদের সদস্যদের মাঝে শ্রেণি ও জাতের বাইরে ধর্মীয় পরিচয়ের অস্তিত্বও বেশ সতেজ। এই বামধারার সংগঠনগুলো দরিদ্র নমশূদ্র-রাজবংশী-মুসলমান চাষিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সে সময় কতটা সফল হয়েছিল, তার এক বড় নজির তেভাগা আন্দোলন। যেখানে রাজবংশী ও নমশূদ্ররা হিন্দু জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতেও দ্বিধা করেনি। তবে পরবর্তীকালে বিস্ময়করভাবে দেখা যায়, কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বাংলা ভাগের প্রশ্নে যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধির অনুরূপ ছিল। বিপরীতে তফসিলি নেতৃত্ব প্রাদেশিক পরিষদে এমন সব দাবিদাওয়া উত্থাপন করছিলেন, যা ছিল কমিউনিস্ট ধাঁচের, নিম্নবর্গীয় শ্রমিক-কৃষকদের অধিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। যেমন বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ১৯৩৭-এর ৫ আগস্ট তফসিলি সদস্য পুলিন বিহারী মল্লিক স্থানীয় সরকারে এবং সরকারি প্রশাসনে দলিত-নমশূদ্রদের জন্য আসন সংরক্ষণের পাশাপাশি 'প্রতিক্রিয়াশীল ভূমি আইনের আমূল সংস্কার' চেয়েছিলেন।[৮৭] ১৯৪২ সালের জুলাইয়ে নিখিল ভারত শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সম্মেলনও যোগেন মণ্ডলের বক্তব্যের আলোকে 'ভূমিহীন শিডিউল কাস্টস চাষিদের জন্য' পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের তাগিদ দেয় এবং প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক জমি ক্রয় করে ভূমিহীন শিডিউল কাস্টসের মাঝে বিতরণের প্রস্তাব করে। এই সম্মেলন একইভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সব পর্যায়ে 'জনসংখ্যার হিস্যা অনুযায়ী' শিডিউল কাস্টসদের জন্য প্রতিনিধিত্ব দাবি করে।[৮৮] অর্থাৎ দলিত-নমশূদ্রদের জন্য সংরক্ষণের মাধ্যমে তফসিলি নেতারা চাইছিলেন অধিকতর এক অংশগ্রহণমূলক সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো,

যা তাঁদের বহুজনবাদী চিন্তার এক অভিপ্রকাশ ছিল। এ সময় কার্যত বাংলার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যার তুলনায় দলিত-নমশূদ্ররা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অবহেলিত ছিল। ১৯৪০-এর বাজেট অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর-অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে, ঢাকায় সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত দশটি স্কুলে নমশূদ্র সম্প্রদায় থেকে একজন শিক্ষকও নেই এবং কর্মচারী রয়েছে মাত্র একজন। একইভাবে অপর এক প্রশ্নোত্তরে দেখা যায়, বাংলার পুলিশ বিভাগে ১৯৩৬-৩৭ সময়ে যে ৭৩ জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পরবর্তী উচ্চতর ধাপে পদোন্নতি পান, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন শিডিউল কাস্টস গোত্রীয়। সরকারি কলেজের ১০৮ জন শিক্ষকের মাত্র একজন ছিল উল্লিখিত সম্প্রদায়ের।[৮৯] প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত এসব তথ্য যেকোনো উপায়ে তফসিলি সমাজে বিদ্যমান স্থিতাবস্থা বদলের তাগিদ বাড়িয়ে চলছিল। ফলে যোগেন মণ্ডলের মতো তফসিলি নেতৃত্বও অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কৌশল হিসেবে 'রাজনৈতিক বন্ধু' অন্বেষণে ব্রতী ছিলেন।

# মুসলিম লীগ-যোগেন মণ্ডল 'মৈত্রী' এবং পরবর্তী চমক

উপমহাদেশের ইতিহাসের কোন পর্যায়ে যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। দ্রুতই যোগেন মণ্ডল জিন্নাহর প্রধান এক রাজনৈতিক সহযোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। যোগেনকে পাশে পেয়ে জিন্নাহ প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগের বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্রের দাবি উত্থাপনের নৈতিক ভিত্তি পান। আবার যোগেন মণ্ডলও জাতীয় পরিসরে এটা তুলে ধরতে সক্ষম হন যে বাংলায় নমশূদ্র ও অন্য দলিতরা পৃথক এক রাজনৈতিক সত্তা এবং এদের প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া যেকোনো 'স্বাধীনতা' অর্থহীন। সেদিন বর্ণহিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে 'তফসিলি হিন্দু' এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির এই দাবির মোকাবিলা করা অতি দুরূহ ছিল। রাজনৈতিক প্রচারযুদ্ধে যোগেনের সরাসরি ভূমিকার কারণেই মুসলিম-দলিত জোটে সিলেটের মতো অঞ্চল আসামে যুক্ত না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল সেদিন।

যোগেনের সঙ্গে জিন্নাহর মৈত্রীর প্রথম বড় প্রভাব পড়ে সিলেট গণভোটে এবং একই সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে বড় এক চমক হিসেবে আবির্ভূত হয়, যখন ১৯৪৬-এর নির্বাচন শেষে (অক্টোবরে) ব্রিটিশ রাজের অধীনে অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ যোগেন মণ্ডলকে তাদের প্রতিনিধি করে। এটা ছিল নাটকীয় এক সিদ্ধান্ত, যা কংগ্রেসের জন্য ছিল চরম বিব্রতকর। কারণ, কংগ্রেস তখন নিজেদের হিন্দু স্বার্থের একমাত্র প্রতিনিধি ভাবছিল, আবার মুসলিম লীগকে হিন্দুবিরোধী হিসেবে তুলে ধরছিল।[১০]

এ সময় শুরুতে ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell); আর লন্ডনে 'সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড বার্মা'

ছিলেন পেথিক লরেন্স (Pethick Lawrence)। ১৯৪৬-এর ১৫ অক্টোবর ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের (যোগেন মণ্ডলসহ পাঁচজন[৭১]) নাম লন্ডনে পেথিক লরেন্সের অনুমোদনের জন্য পাঠান। কিন্তু তারা একজন 'অচ্ছুত' হিন্দুকে মুসলিম লীগ প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছিল, যা ছিল কার্যত কংগ্রেসের প্রতি ব্রিটিশ সহানুভূতির স্মারক।[৭২] অথচ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেস মনোনীত মন্ত্রীদের মাঝেও একজন শিডিউল কাস্ট ছিলেন (জগজীবন রাম) এবং তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করা হয়।

বস্তুত মুসলিম-দলিত মৈত্রী ইতিহাসের এ পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এত দিনকার সুশীল নিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচন করে ফেলে। কিন্তু বাংলার বাইরেও আগ্রা, ফতেহগড়, দিল্লি, বোম্বেতে মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্ত অভিনন্দিত হয়েছিল। গবেষক দ্বৈপায়ন সেন লিখেছেন, 'অনেক স্থানেই তফসিলিরা এই মনোনয়নের সমর্থনে মিছিল বের করে। এরূপ একটি মিছিল তাঁর বাসভবনে এলে ১৬ অক্টোবর জিন্নাহকে উপস্থিত তিন হাজার তফসিলির উদ্দেশে ভাষণও দিতে হয়।'[৭৩] জিন্নাহর সঙ্গে তফসিলিদের এই ঐক্যের আমেজ মোকাবিলা করতেই কংগ্রেস কিছুদিন পর অন্তর্বর্তী সরকারে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত করে মাওলানা আজাদকে। এর মধ্য দিয়ে তারাও নিজেদের ইসলামবান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। লীগ ও কংগ্রেসের উক্তরূপ পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক পরিবেশেও নিজের রাজনৈতিক পেশাদারত্বের প্রশ্নে যোগেন মণ্ডল যে সচেতন ছিলেন, সেটা দেখা যায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যুক্ত হওয়া মাত্র (১৭ অক্টোবর) এক সংবাদ সম্মেলন থেকে। সেখানে তিনি বলেন :

> যদিও আমার অন্তরের গভীরে রয়েছে শিডিউল কাস্টদের স্বার্থের প্রশ্ন, কিন্তু সরকারের একজন হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য হবে মুসলিম লীগের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। কারণ, তারা আমাদের স্বার্থে কাজ করতে অঙ্গীকার করেছে। দ্বিতীয়ত, আমাকে কাজ করতে হবে বর্ণ ও প্রদেশ নির্বিশেষে পুরো দেশের জন্য। তৃতীয়ত, আমি তফসিলিদের উন্নয়নে কাজ করব। আমরা অনেক অন্যায়ের শিকার হয়েছি। এটাই আমার বড় দায়িত্ব, ক্রমাগত সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।[৭৪]

যোগেন মণ্ডলের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের ক্ষেত্রে আম্বেদকরেরও সায় ছিল। ওই সময় তিনি ব্রিটেনে অবস্থান করছিলেন। যদিও এ সময় একরূপ

একটি অপ্রকাশ্য বিতর্ক ছিল যে আম্বেদকর থাকাবস্থায় যোগেন মণ্ডলকে কেন জিন্নাহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তফসিলি প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই করেছিলেন। এর সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে মনে করা হয়, আম্বেদকর বাংলা থেকে সংবিধান সভায় নির্বাচিত হলেও কার্যত তিনি উপমহাদেশের যে অঞ্চলের মানুষ ছিলেন, সেখানে মুসলিম লীগের সরাসরি রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল সামান্যই।

তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তখনকার ভারতের আট কোটি তফসিলির দুজন সদস্য থাকলেও কার্যত তাঁরা ছিলেন ওই পর্যায়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের খুবই অনুগত প্রতিনিধি। আম্বেদকর সদস্য হলে হয়তো ভিন্নতর স্বাতন্ত্র্যময় কিছু হতে পারত। আবার জিন্নাহ কর্তৃক তাঁকে মনোনীত না করার পেছনে সেটাও একটা পরোক্ষ কারণ হতে পারে।

# পাকিস্তানে যোগেন মণ্ডল : রাজনৈতিক বাজি

সাতচল্লিশের উত্তাল সময়টিতে পাকিস্তান সৃষ্টিতে যোগেনের অবদান সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে যিনি উপলব্ধি করতেন, তিনি জিন্নাহ। তারই ফল পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রীও হন যোগেন মণ্ডল। এই নিয়োগ নবগঠিত দেশটির প্রায় ৬০-৭০ লাখ দলিতকে বিশেষ ভরসা দিয়েছিল। জিন্নাহ ১৯৪৭-এর ১১ আগস্ট[৭৫] পাকিস্তানের সংবিধান সভার যে অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন, তাতে সভাপতিত্ব করছিলেন যোগেন মণ্ডল।[৭৬] জিন্নাহর তরফ থেকে এটা ছিল ইতিবাচক এক বার্তা, যে বার্তার ওপর ভরসা করেছিলেন যোগেন মণ্ডলও। তবে স্পষ্টত মুসলিম লীগে যোগেনের প্রতি লিয়াকত আলী খান, নাজিমুদ্দিন প্রমুখের মনোভাব জিন্নাহর মতো ছিল না।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে বাকেরগঞ্জের নমশূদ্র যোগেন মণ্ডল করাচিতে যে বড় বড় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তা শুধুই এ রকম একটি বিবেচনা থেকে যে পাকিস্তান বর্ণহিন্দুদের ভারতের মতো হবে না। অর্থাৎ তিনি জিন্নাহর এই আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক বিবেচনা পাকিস্তান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখলেও দেশটি ধর্মরাষ্ট্র হবে না।[৭৭] এখানে সংখ্যালঘু তফসিলি জাতি ও দলিতদের অদ্ভুত 'অপর' বিবেচনা করা হবে না। কেবল জিন্নাহই নন, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও ১৯৪৭-এ এক বিবৃতিতে এরূপ উল্লেখ করেছিলেন, 'পাকিস্তান কেবল মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়, এই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সব মানুষ ও সম্প্রদায়েরই জায়গা এটা।'[৭৮] জিন্নাহ ও নাজিমুদ্দিনের এরূপ বক্তব্য ছিল যোগেনের বহুজনবাদী রাজনীতিরই প্রতিধ্বনি।

জিন্নাহ এবং তাঁর প্রধান সহযোগীদের এরূপ অঙ্গীকারে যোগেনের আস্থার কারণেই পূর্ববঙ্গের লাখ লাখ নমশূদ্র ও দলিত ভারতে পাড়ি জমাননি; তাঁরা

পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু সদ্যগঠিত পাকিস্তানের বয়স ১৩ মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা যান।[১৯] পরবর্তীকালে লিয়াকত আলী খান মন্ত্রিসভা এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন নতুন আমলাতন্ত্র, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা ছিল প্রবল, ক্রমে জিন্নাহর রাষ্ট্রনৈতিক অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে দলিত তফশিলিদের ওপর নিপীড়ন নেমে এলে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ যোগেন মণ্ডল কেবল যে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন তা-ই নয়, পাকিস্তানও ত্যাগ করেন। সময়টা তখন ১৯৫০-এর অক্টোবর। ৮ অক্টোবর তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে পৌঁছান।

পদত্যাগের পাশাপাশি যোগেন মণ্ডল সেই সময় দীর্ঘ এক পদত্যাগপত্রে তাঁর পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বাপর কারণ বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে মূলত তিনি জিন্নাহর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে পাকিস্তানের পশ্চাদপসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে দায়ী করেন। বহুমাত্রিক হতাশাভরা ছিল সেই পদত্যাগপত্র। পদত্যাগ পত্রে যোগেন মণ্ডল লেখেন:

> ...পূর্ব বাংলায় পিছিয়ে পড়া হিন্দুসমাজের অবস্থা উন্নয়নের জন্য আমার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর চরম হতাশা এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আপনার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করছি।...লীগকে সহায়তার পেছনে আমার কিছু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল...বাঙালি মুসলমানদের সাথে নমশূদ্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল রয়েছে। মুসলমানরা ছিল মূলত কৃষক-শ্রমিক, অস্পৃশ্যরাও তাই। মুসলমানদের একটি অংশের মতো নমশূদ্রদের একটি অংশও ছিল জেলে। দ্বিতীয়ত, তারা উভয়ে ছিল লেখাপড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। আমাকে বোঝানো হয়েছিল, লীগ এবং এর মন্ত্রিসভার সাথে আমার সহযোগিতা বিশাল পরিসরে আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। এই পদক্ষেপসমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাকে আমলে না নিয়ে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে এবং তাতে সাম্প্রদায়িক শান্তি-সৌহার্দ্য আরও মজবুত হবে, এমনটিই বলা হয়েছিল।...কলকাতার ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের পর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে এক ভোটাভুটি আয়োজিত হয়। শুধু আমার চেষ্টা দ্বারাই কংগ্রেসের পক্ষের চারজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সদস্য এবং চারজন অস্পৃশ্য সদস্যের সমর্থন জোগাড় করা সম্ভব হয়, যা ব্যতীত মন্ত্রিসভার পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।...গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর

> ১১ আগস্ট ১৯৪৭-এ দেওয়া ভাষণও লীগের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস আরও পোক্ত করে। এই ভাষণে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষকেই সমানভাবে বিবেচনার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন এবং তাদের আহ্বান করেন এটা মনে রাখতে যে তারা সবাই পাকিস্তানি। ইসলামিক রাষ্ট্র ও তার মুসলিম নাগরিকদের সার্বক্ষণিক হেফাজতে সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম এবং 'জিম্মি'দের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদের প্রশ্নই ছিল না। এটা প্রতীয়মান হয় যে আপনার জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে কায়েদে আজমের ইচ্ছা ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হিসেবে এই সব ওয়াদার বরখেলাপ করা হচ্ছে, যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতি ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ভারত ভাগের পরে, বিশেষ করে কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর থেকে নমশূদ্ররা কোনো বিষয়েই তাদের প্রাপ্য বুঝে পায়নি। ...[১০০]

উল্লিখিত পদত্যাগপত্র থেকে এ-ও বোঝা যায় যে কেবল লিয়াকত আলী খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আদর্শিক বিরোধই নয়, পূর্ব বাংলায় তৎকালীন খাজা নাজিমুদ্দিন ও নুরুল আমিনের শাসনকালে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় নমশূদ্রদের প্রত্যাশিত প্রতিনিধি না থাকার বিষয়েও যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরোধ তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ যোগেন মণ্ডল কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্থানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এ সময় পূর্ব বাংলায় যোগেন মণ্ডলের প্রভাব কমাতে দলিত-নমশূদ্র সমাজে বিভক্তি আনারও চেষ্টা শুরু করে।

এ ছাড়া ১৯৪৮-৪৯ থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে নমশূদ্রদের ওপর হামলার ঘটনা এবং তাতে প্রশাসনের ইন্ধনও যোগেন মণ্ডলকে হতাশ করে তোলে। এ সময়, ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উদ্বিগ্ন যোগেন মণ্ডল করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মনোরঞ্জন ধর, অধ্যাপক সমর গুহ প্রমুখের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে সাক্ষ্য মেলে।[১০১] এর পরদিন তিনি ঢাকা এবং পরে ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল সফর করেন ব্যাপকভাবে। সংখ্যালঘুদের মনে সাহস সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি কিছুদিন ঢাকায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি।

'দাঙ্গা' নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই সময়ের আরেকটি উদ্যোগ ছিল 'দিল্লি চুক্তি'। ছয় দিনের আলোচনা শেষে লিয়াকত আলী খান ও জওহরলাল নেহরুর মাঝে এই চুক্তি হয় ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল। তখন উভয় দেশেই থেমে থেমে দাঙ্গা

চলছিল এবং উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কও অতি নাজুক মর্যাদায় পৌঁছেছিল। এই চুক্তিতে দুই প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘু শরণার্থীদের সম্পত্তি বিক্রি বা বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া, অপহৃত নারী ও লুটকৃত সম্পদ ফেরতের ব্যবস্থা নেওয়া এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি নথিভুক্ত না করার ব্যাপারে সমঝোতায় এসেছিলেন। বস্তুত এই চুক্তি ছিল সদ্য স্বাধীন দুই রাষ্ট্রের নির্লজ্জতার এক ঐতিহাসিক দলিল, যেখানে উভয় পক্ষই পরোক্ষে দাঙ্গা রোধে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদানে তাদের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছিল। তবে এই চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের মাঝে ন্যূনতম একটা আশাবাদও তৈরি করেছিল।[১০২] যদিও পরবর্তী ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয় যে নেহরু এবং লিয়াকত আলী কেউই দিল্লি চুক্তি'র অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করতে পারেননি এবং তা সম্ভবও ছিল না। কারণ 'ঐক্য'-এর বিপরীতে রাজনীতিবিদদের 'ভাগ'-এর কৌশল ইতিমধ্যে দলিত-নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের সহাবস্থান ও বোঝাপড়ার ঐতিহাসিক জমিনকে কলুষিত করে ফেলেছিল।[১০৩]

পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল উপরিউক্ত বাস্তবতার এক উজ্জ্বল অংশ। প্রাদেশিক সরকার দাঙ্গা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছিল না। এ সময় যোগেন মণ্ডল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর শেষে আবার করাচি ফিরে যান। তত দিনে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতভিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলা সফরকালে কেন যোগেন মণ্ডল মুসলমান দাঙ্গাকারীদের 'গুন্ডা' বলেছেন এবং এত দিন তাঁর পূর্ববঙ্গে অবস্থানের হেতু কী, এসব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ ঘটে।

এ সময় আরও কয়েকটি ঘটনা যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগকে ত্বরান্বিত করেছিল। কার্তিক ঠাকুরের গ্রন্থে[১০৪] তার নিরূপ বিবরণ পাওয়া যায়:

> ...এ সময় আইনসভায় পেশ করার জন্য তাঁকে একটি বিলের খসড়া দেওয়া হয়। বিলটির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। এমনকি কেউ ব্যক্তিগতভাবে, নিজের বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের কাছেও যদি মন্তব্য করে যে ভারত বিভক্ত করা উচিত হয়নি এবং তাতে মুসলমানদের কোনো মঙ্গল হয়নি তা-ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে। এরূপ 'অপরাধ'কে সাত বছর কারাভোগযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়।...যোগেন মণ্ডল আইনমন্ত্রী হলেও জানতেন না কে বিলটি প্রস্তুত করেছে। অনুসন্ধানের পর আইনসচিব জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিলটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যোগেন মণ্ডল

এরূপ বিল পেশের দায়িত্ব নিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন।...ঠিক এই সময় লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস *আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেন মণ্ডলের দাঙ্গাবিষয়ক বিবৃতির একটি কপি দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অভিযোগ করে যে, এর ফলে বিদেশে পাকিস্তান দূতাবাস খুব বিব্রত অবস্থায় পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই বিবৃতি প্রকাশের জন্য *আনন্দবাজার*-এর নিকট একটি প্রতিবাদ প্রেরণের জন্য যোগেন মণ্ডলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু যোগেন মণ্ডল জানান যে বিবৃতিতে যা প্রকাশিত হয়েছে তা যথাযথ, এতে প্রতিবাদযোগ্য কিছু নেই। এসবই তাঁর পদত্যাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

বস্তুতপক্ষে জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বড় ধরনের এক ভাবাদর্শিক স্থানান্তর ঘটে ১৯৪৯-এর মার্চে 'অবজেকটিভ রেজল্যুশন'-এর মাধ্যমে, যার মধ্য দিয়ে 'সেক্যুলার পাকিস্তান'-এর 'ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র' হিসেবে যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়। অবজেকটিভ রেজল্যুশন ছিল কার্যত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য কিছু মৌলিক নির্দেশক নীতিমালা, যা সংবিধান সভায় উপস্থাপিত হয় ১৯৪৯-এর ৭ মার্চ এবং গৃহীত হয় ১২ মার্চ। এই নীতিমালাসমূহের সারমর্ম ছিল, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানটি হবে ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক। এই রেজল্যুশনের প্রথমেই বলা হয়:

> Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority which He has delegated to the state of Pakistan, through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust.

এই রেজল্যুশন সম্পর্কে বিতর্ককালে সংবিধান সভায় দেশটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের[১০৫] সব সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তা গৃহীত হয়ে পাকিস্তানের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২-(ক) আকারে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। 'অবজেকটিভ রেজল্যুশন' নিয়ে বিতর্ককালে নমশূদ্র সদস্যরা সেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার-সম্পর্কিত ধারায় 'শিডিউল কাস্ট' শব্দদ্বয়ও অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়, যা ছিল স্পষ্টত জিন্নাহ ও যোগেন মণ্ডলের মৈত্রীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশে যে বহুত্ববাদী রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তার অপমৃত্যু।

মূলত অবজেকটিভ রেজল্যুশনের ওপর ভর করেই পরবর্তীকালে 'রিপাবলিক অব পাকিস্তান' 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' নাম ধারণ

করে। শুধু নামের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানে 'ইসলামি জাতীয়তাবাদ'-এর একরূপ নবযাত্রা ঘটে পরবর্তী সময়ে। অর্থাৎ জিন্নাহ ও তাঁর মুসলিম লীগ 'দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ'-এর যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিলেন, ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের কাছে সেই প্রচেষ্টাগুলির রূপান্তর ঘটল একটি 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আকারে।

যদিও পাকিস্তানের সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, 'আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান', কিন্তু কার্যত পরবর্তীকালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া এবং ধর্মকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক স্থানে স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশটির অন্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্বের সমানাধিকারকে স্ববিরোধিতার মুখে ফেলা হয়। এ সময় যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হলো ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে যে তফসিলিরা ছিল মুসলিম লীগের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 'রাজনৈতিক মিত্র', তারাই ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে হয়ে গেল শুধুই 'হিন্দু সংখ্যালঘু'। এমন 'হিন্দু', 'শিখ'—যারা পাকিস্তানকে বাসভূমি ভেবেই দেশান্তরের বিকল্পকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই হয়ে উঠল 'মূলধারা'র মুসলমানদের জন্য 'নাপাক' 'অপর জনগোষ্ঠী'। স্পষ্টতই এটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে যোগেন মণ্ডলের নিজেকে প্রত্যাহারকে বড় এক ন্যায্যতা দেয়।

পাকিস্তানের জিন্নাহ পরবর্তী নেতৃত্বের এরূপ ভূমিকা যেখানে দলিতদের মতো ভিন্ন ধর্মীয়দের জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের পরিসর যত কমিয়ে ফেলছিল, ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠকদের জন্য ততই তা সুবিধাজনক হচ্ছিল। ইতিমধ্যে জিন্নাহর মতোই গান্ধীও ভারতের রাজনৈতিক পরিসর থেকে দ্রুতই হারিয়ে গেছেন। ফলে ভারতেও মুসলমানরা ক্রমে নাজুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছিল। ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের এরূপ সুবিধাজনক সময়ে যোগেনের পাকিস্তানের ত্যাগ তাদের জন্য ছিল এক নৈতিক বিজয়। এটা তাদের জন্য নতুন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর মধ্য দিয়ে দলিত নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের ঐতিহাসিক ঐক্যে চূড়ান্তভাবে আঘাত হানা সম্ভব হয়। পূর্ব বাংলায় নমশূদ্রদের জীবনে খারাপ বার্তা হিসেবে হাজির হয় এই পরিস্থিতি।

যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান ত্যাগমাত্রই মুসলমান ও নমশূদ্র-দলিত, যারা ছিল কার্যত হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের রাজনীতির বিরুদ্ধে একক পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো মিত্র, তাদের এবার বিভিন্ন স্থানে পরস্পরের সঙ্গে হানাহানিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এর সরাসরি দুটি ফল হয়েছিল। প্রথমত, তফসিলি

মানুষদের রাজনৈতিক মনোবলে ফেল ধরে এবং তাদের অধিক হারে দেশত্যাগ,[১০৬] যা সীমান্তের উভয় পারে হামলা-পাল্টা হামলার এক দুষ্টচক্রের জন্ম দেয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যার উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন, 'পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে যাওয়া দলিত-নমশূদ্রদের নদীয়া গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের পূর্ব বাংলায় আসতে বাধ্য করতে দেখা যায়।'[১০৭]

দ্বিতীয়ত, যোগেনের পাকিস্তান ত্যাগমাত্রই পূর্ব পাকিস্তানে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের সাংগঠনিক বিলুপ্তি ঘটে। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অনেকাংশেই অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়ে, যা আবার পরোক্ষে মুসলিম লীগের রাজনীতিকেও পাল্টে দিতে থাকে। পুরোনো মুসলিম লীগের ভেতর থেকে জন্ম হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের। কিছুদিন পরই (১৯৫৫ সালের অক্টোবরে) এই দল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ পড়ে এবং এই দলে অমুসলমানদের অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলায় থেকে যাওয়া স্বল্পসংখ্যক বর্ণহিন্দুই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে নেহরুর প্রভাবও কাজ করেছিল। ভারত থেকে ফিরে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার পূর্বতন কংগ্রেস নেতাদের আওয়ামী লীগে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন।[১০৮] তবে এই সিদ্ধান্তের পেছনেও এমন গভীর রাজনীতি ছিল, যাতে নতুন করে তফসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা অবস্থা নিশ্চিত হয়। এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পূরক উদ্যোগ হিসেবে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের এক উদ্যোগ নেয়।

এই উদ্যোগের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল ১৯৫৪-এর নির্বাচন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের পদ্ধতিতে এই নির্বাচন হয়। প্রাদেশিক পরিষদে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৭২টি ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য।[১০৯] প্রাদেশিক পরিষদে এই ৭২ জন অনেক সময়ই নীতিনির্ধারণী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন। এতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ক্রমাগত অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। ফলতই নির্বাচনে বিজয়ী 'যুক্তফ্রন্টে'র প্রধান এক শরিক আওয়ামী মুসলিম লীগ সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি তোলে এবং তাকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। এই একটি শব্দ বাদ দিয়েই আওয়ামী লীগ রাতারাতি 'অসাম্প্রদায়িক দলে'

পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি তোলার পেছনে আওয়ামী লীগের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক পরিষদে নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের প্রভাব কমানো। খোদ সোহরাওয়ার্দী এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে কার্তিক ঠাকুর এ ক্ষেত্রে যেসব উদাহরণ তুলে ধরেছেন, তার কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ:

> ... খুলনা জেলায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান। পৃথক নির্বাচনে এই জেলা হতে আটজন মুসলমান এবং সাতজন হিন্দু নির্বাচিত হন। ফলে খুলনা জেলা বোর্ডেও সে রকমই নির্বাচিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে ৩০ সদস্যের মধ্যে ২৮ জন মুসলমান এবং দুজন মাত্র হিন্দু নির্বাচিত হলেন। একইভাবে ফরিদপুর জেলা বোর্ডে পৃথক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ২৫ জন মুসলমান এবং ১১ জন হিন্দু নির্বাচিত হওয়ার কথা। কিন্তু যুক্ত নির্বাচনে সেখানে মুসলমান নির্বাচিত হলেন ৩২ জন এবং হিন্দু সুযোগ পেলেন চারজন।[১১০]

উল্লিখিত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক হিসাবেরই ফল হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' শুধু 'আওয়ামী লীগ' হয়ে গেল এবং পৃথক নির্বাচন বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলা পেল যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি। আর এর মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরু অংশ তফসিলিরা রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায় প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে গেল অনেকটা চিরদিনের জন্যই।

এ অবস্থার ফল হয় এই যে যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়া যেমন একদিকে পাকিস্তানে বহুজনবাদী রাজনীতির জন্য কঠিন পেরেক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা তফসিলি নেতৃত্বকে রাজনীতির পরিসর থেকে নীরবেই সরিয়ে দেয়।

অনুরূপ হতাশাজনক ব্যাপার ঘটেছিল তখন ভারতে, যোগেন মণ্ডলের ভূতপূর্ব প্রধান রাজনৈতিক মিত্র আম্বেদকরের ক্ষেত্রেও। দেশভাগের পরপরই প্রথমে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংবিধান সভায় আম্বেদকরের পুনঃপ্রবেশ ঘটে (যেহেতু বাংলায় তাঁর পূর্বতন নির্বাচনী এলাকা পাকিস্তানে পড়ে গিয়েছিল) এবং গান্ধীর আহ্বানে নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম মন্ত্রিসভায় যুক্ত হন তিনি। কিন্তু ১৯৫০ সালেই এই 'জোটবদ্ধতা' ভেঙে যায়। ১৯৫১ সালে হিন্দু কোড বিল নিয়ে মতবিরোধের কারণে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয় তাঁকে এবং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তর বোম্বে

আসলে কংগ্রেস সর্বোচ্চ চেষ্টায় তাঁকে হারাতে সক্ষম হয়। এভাবেই পাকিস্তানে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সঙ্গে মুসলিম লীগের মৈত্রী ভেঙে পড়ার আদলেই ভারতেও প্রায় একই সময়ে তা ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানে মুসলমান নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী ধারা এবং ভারতে হিন্দু নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী অংশ ঐতিহাসিক ওই দুর্ঘটনার জন্য সরাসরি দায়ী ছিল। যোগেন্দ্রনাথ এবং আম্বেদকর উভয়ে দেশভাগ এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তফসিলি ফেডারেশনের পরাজয়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দুই দেশের প্রধান দুটি দলের নেতৃত্বাধীন সরকারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং সরকারকে ব্যবহার করে দলিতদের জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই কৌশল ব্যর্থ হয়। হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্বের প্রভাবশালী দুই ধারা ভারতে এবং পাকিস্তানে দলিত তফসিলি রাজনীতির প্রধান দুই ব্যক্তিকে চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই সফলতার সঙ্গে ও কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনমন্ত্রী হিসেবে আম্বেদকর নিজেই হিন্দুকোড বিলটি উত্থাপন করেছিলেন ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারিতে, যাতে বিশেষভাবে হিন্দু নারীদের সম্পত্তিতে অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। উত্থাপনের আগে এই বিল মন্ত্রিসভায় অনুমোদিতও হয়েছিল। কিন্তু পার্লামেন্টে উত্থাপনের পর দেখা যায় মন্ত্রিসভার সদস্য বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আম্বেদকরের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। উল্লেখ্য, শোভোক্তজন অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তাঁর সংগঠন মহাসভাকে ১৯৪৭-এর আগে-পরে বাংলায় আম্বেদকরের সহযোগী যোগেন মণ্ডলের রাজনীতির এক তীব্র বিরোধিতাকারী হিসেবেও দেখি আমরা।

# ভারতে 'বিশ্বাসঘাতক' যোগেন মণ্ডল 'বহুজন রাজনীতি' পুনর্গঠন-চেষ্টা

ভারতে যোগেন মণ্ডল গিয়ে ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র দলিতদে বিশাল অংশ তখন পশ্চিমবঙ্গমুখী উদ্বাস্তু। আর পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অনে দরিদ্র মুসলমান তত দিনে পূর্ব বাংলায় পৌঁছে গেছে। 'স্বাধীনতা' নামী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া'য় উভয় সম্প্রদায়ের যে কোনো মতামতই নেয়া হয়নি, সেটা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। দেশভাগকারীদের কাছে এরা ছি শুধুই 'হিন্দু' বা 'মুসলমান'। 'স্বাধীনতা' এদের বসতভিটা ছাড়তে বাধ করেছিল। সংখ্যায় বিপুল মুসলমান ও তফসিলি উদ্বাস্তুদের আসা-যাওয়া চলছে তখন পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত দিয়েও।

পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন পথে দলিত-নমশূদ্র উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানো মাত্র তাদের পরিচয় নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল 'হিন্দু উদ্বাস্তু' হিসেবে। এভাবে কার্যত ১৯৪৭-পূর্ব বাংলার দলিতদের স্বতন্ত্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থানটি সমকালীন ইতিহাসে উধাও হয়ে যায়। উদ্বাস্তু গমনাগমনের প্রথম দিকে ভারত গমনকারী হিন্দুদের মাঝে ধনী বর্ণহিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাদের আর নিম্নবর্ণের তফসিলিদের দেশান্তরের ফলাফল হয়েছিল ভিন্ন। নিম্নবিত্ত তফসিলিদের সম্পদ, শিক্ষা ও যোগাযোগ দক্ষতার স্বল্পতা তাদের ভারতে চূড়ান্তভাবে বিড়ম্বিত করেছিল, উচ্চবর্ণীয়দের বেলায় যা ঘটেনি।

আগেই বলা হয়েছে, যোগেন মণ্ডল এবং তাঁর রাজনীতির অনুসারীরা, যাঁরা একই সঙ্গে আম্বেদকরেরও অনুসারী ছিলেন, ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা ছাড়তে রাজি ছিলেন না। মুসলমানদের মতোই তাঁরাও পাকিস্তানের স্রষ্টা ছিলেন। কিন্তু ওই সময়েই তফসিলি সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ পশ্চিম বাংলায় পাড়ি জমাচ্ছিলেন। ফরিদপুরকেন্দ্রিক মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব, বিশেষ করে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের অনুসারীরা ছিলেন শেষোক্ত দলে।

তফসিলিদের এই বিভক্তি দৃশ্যমান হচ্ছিল দেশভাগের অন্তত অর্ধদশক পূর্ব থেকেই। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই ('বাংলার দলিত-নমশূদ্র আন্দোলনে বিভক্তি' অধ্যায়ে) বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। সম্প্রদায়গত এই 'পার্টিশনে'রও চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। যোগেন মণ্ডল, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, জগবন্ধু মণ্ডল, ধনঞ্জয় রায় প্রমুখ মনে করতেন মুসলিম লীগের সঙ্গে যৌথভাবে 'বহুজন' রাজনীতির চর্চাই বাংলায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বর্ণবিদ্বেষমুক্ত সমাজ গড়তে পারে। এঁরা বাংলা ভাগেরও বিরোধী ছিলেন।

অন্যদিকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, মহানন্দ হালদার, কমলাকান্ত দাস প্রমুখ মতুয়া প্রভাবিত তফসিলি নেতৃত্ব মনে করতেন বাংলার ঐকান্তিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তা না হলেও অন্তত তফসিলি প্রভাবিত জেলাগুলোর পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। এঁরা দেশভাগের প্রাক্কালেই ভারতে চলে যান। নদীয়ার বগুলা এবং চব্বিশ পরগনার বনগাঁকে ঘিরে এঁরা তাঁদের অনুগামী তফসিলিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন। পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন।

পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ শেষে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে যোগেন মণ্ডল উদ্বাস্তুদের মধ্যে আবার নতুন করে তাঁর বহুজনবাদী রাজনীতির চর্চা করতে মনস্থ করেছিলেন। যদিও সেখানে তাঁকে নামতে হয় নতুন মিত্রের সন্ধানে এবং দলিত-নমশূদ্রদের মধ্যে তখন বর্ণ প্রশ্নটির চেয়েও জরুরি ছিল পুনর্বাসনের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি। দাঙ্গা ও দেশভাগ যে রাজনৈতিকভাবে নমশূদ্র-দলিতদের কতটা নিঃস্ব করে ফেলেছিল, উল্লেখিত পরিস্থিতি ছিল তারই স্মারক এবং এটা দাঙ্গা ও দেশভাগের বিরোধিতায় যোগেনের রাজনীতির যথার্থতাই তুলে ধরে। যদিও সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবসর ছিল না তখন কারো। বস্তুত যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক অবস্থানের তাত্ত্বিক সঠিকতা এবং ব্যবহারিক ব্যর্থতা বহুকালের জন্যই বাংলায় দলিত-নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বহুজনবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে তমসাচ্ছন্ন করে ফেলে।

এ সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংগঠনগুলো গড়ে উঠছিল মুখ্যত ক্যাম্পভিত্তিক উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের দাবিতে। শরণার্থীদের শুধু পশ্চিমবঙ্গে রাখা হবে, নাকি দূরদূরান্তে পুনর্বাসন করা হবে, সে নিয়েও এ সময় বিতর্ক শুরু হয়। উদ্বাস্তুরা নিজেরা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থায় ছিলেন না। তাঁদের নেতাদের মধ্যে প্রমথরঞ্জনদের সঙ্গে যোগেন মণ্ডলের এ প্রশ্নে ভিন্নমত তৈরি হয়। যোগেন মণ্ডলরা চাইছিলেন পশ্চিমবঙ্গেই পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের পুনর্বাসন হোক। অন্যদিকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুররা মনে করতেন সুদূর আন্দামানেও তাদের পুনর্বাসন করা যেতে পারে, বরং ওই মুহূর্তে পুনর্বাসনটাই

জরুরি প্রশ্ন। এ সময় শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য উড়িষ্যা-মহারাষ্ট্র-অন্ধ্র-মধ্যপ্রদেশের মাঝে দণ্ডকারণ্য নামে একটি জায়গাও তৈরি করা হয়।

প্রতিনিয়ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ছিল তখন। করাচি থেকে ভারত গিয়ে যোগেন মণ্ডল চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বর্ধমান এবং বীরভূমজুড়ে উদ্বাস্তুকেন্দ্রিক রাজনীতিতে নিবেদিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যান, তখন উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভার মুসলিমবিদ্বেষী নীতি ও প্রচারাভিযান বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি করে চলেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ লাগছিল পূর্ব বাংলাতেও। হিন্দু মহাসভা এ সময় ভারতে (এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে) মুসলমানদের ভোটাধিকার না দেওয়ার পক্ষে তীব্র প্রচারণা চালাতে থাকে। এর ফলে পূর্ব বাংলাজুড়ে তফসিলি-বর্ণহিন্দুনির্বিশেষে হিন্দুদের স্থিতি উধাও হচ্ছিল। তফসিলিরাও অনেকে তখন একরকম মুসলিমবিদ্বেষ নিয়েই পশ্চিমবঙ্গমুখী হচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে প্রাথমিকভাবে যোগেন মণ্ডলের বহুজন রাজনীতি অনেকখানি আবেদন হারিয়ে ফেলছিল। এটা ছিল তফসিলিদের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের একটা পরিবর্তনের কাল। বৃহত্তর রংপুরের রাজবংশীদের একাংশও তখন একই অভিজ্ঞতা নিয়ে ও একইভাবে দেশ ছাড়ছিল।

কোনো কোনো তফসিলি এ সময় তাঁদের দুর্ভোগের জন্য যোগেন মণ্ডলের নীতিকেই দায়ী করছিলেন। কারণ, বাংলা ভাগের আগে পূর্ব বাংলাজুড়ে জনসভা করে যোগেন মণ্ডল তাঁদেরকে দেশ না ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং এ-ও বলেছিলেন, মুসলিম লীগ তাঁদের নিরাপত্তা ও সমমর্যাদা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেবল ১৯৪৭-এর আগে-পরেই নয়, ১৯৫০ দাঙ্গার পরও যোগেন মণ্ডল এ রকম কথা বলেছিলেন। পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে, তাঁর বক্তব্যে আশ্বস্ত অনেকে মনে করতে থাকেন, যোগেন মণ্ডলসহ তখন যদি সমগ্র তফসিলি সম্প্রদায় একসঙ্গে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় যেতেন আর ব্যাপারটা যদি 'লোক বিনিময়'-এর আদলে ঘটত, তাহলে তাঁদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হতো। এ পর্যায়ে তাই 'বিশ্বাসঘাতক' গালিও শুনতে হয় যোগেন মণ্ডলকে। বলা যায়, ১৯৪৭-এর পর পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগেন মণ্ডল ছিলেন ভারতে সবচেয়ে অপমানিত, ঘৃণিত ও প্রশ্নবিদ্ধ একজন ব্যক্তি। এক শূদ্রের এতটা রাজনৈতিক নিরীক্ষা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না তখনকার বিক্ষুব্ধ সময়।

তাঁর প্রতি এই বিরূপ মনোভাব কাটাতে যোগেন মণ্ডলকে এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীশিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে উদ্বাস্তুদের কাছে

নিজের রাজনৈতিক অবস্থানটি ব্যাখ্যা বা পরিষ্কার করতে হয়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় *আমার দু-চারটি কথা* শীর্ষক পুস্তিকা ছাপিয়ে যোগেন বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশে নিজের অতীত ভূমিকার ব্যাখ্যা দেন এভাবে:

> ...আমি বাংলা ভাগের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছি।... আমি তখন ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলাম। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে বাধা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া ২২ এপ্রিল তারিখে আমার নতুন দিল্লীস্থ সরকারী বাসভবনে একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করি...সেই বিবৃতিতে আমি বলিয়াছিলাম, যদি বাংলা ভাগ একান্তই হয় তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভিটামাটি ও বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায় থাকিবে না। ...গান্ধীজী তখন ভারতের একচ্ছত্র নেতা। সর্দার প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রভৃতি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতাগণ সকলেই তখন জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কেহই কিছু করিলেন না, আমিই ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিলাম। যেন ভারতবর্ষটার উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব আমারই ছিল। খুলনা জিলা পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার জন্যও একদল লোক আমাকে দায়ী করেন। এ যেন খুলনা আমার পৈতৃক জমিদারী। আমি ইচ্ছা করিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীটা পাকিস্তানকে উপহার দিলাম।...নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভায় আরও পাঁচজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। দু'জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় একমাত্র আমিই যোগেন আলী মোল্লা নামে অভিহিত হলাম।[১১১]

এভাবে নিজের রাজনৈতিক অতীতের যাথার্থতা তুলে ধরার পাশাপাশি এ সময় যোগেন মণ্ডল উদ্বাস্তুদের সমস্যাগুলো নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করায় তাঁর প্রতি আবারও তফসিলিদের এক বড় অংশের আস্থা ফিরে এলেও, তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। প্রমথরঞ্জন ঠাকুররা ততদিনে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা চাইছিলেন যোগেন মণ্ডলও যেন তা-ই করেন। তাঁকে কংগ্রেসে যুক্ত হতে বিভিন্ন তরফ থেকে অনুরোধও করা হচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু দেশভাগ-পূর্ববর্তী সময় থেকে যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি ছিল বর্ণহিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে, তাই নতুন পরিস্থিতিতেও স্বতন্ত্র অবস্থান থেকেই তিনি নিজের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) কাছাকাছি আসতেও দেখা গিয়েছিল, বিশেষত 'ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল (ইউসিআরসি)'[১]-এ কাজ

করার সময়। স্থানীয় কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পুনর্বাসন দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উদ্বাস্তুদের মাঝে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দেয় এবং বিরোধী বামপন্থীদের সঙ্গে নৈকট্যের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তারপরও যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে বামদের সম্পর্ক ঠিকঠাক হয়নি।

স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে শরণার্থীদের অধিকারভিত্তিক আন্দোলন করতে গিয়ে এ সময় তীব্র রাজনৈতিক বাধায় পড়েন যোগেন মণ্ডল। ১৯৫৮ সালের মার্চে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কয়ারে সত্যাগ্রহকালে তাঁকে আটক করা হয়। ৩৫ দিন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকেন তিনি। এই আন্দোলনকালে দেখা গেছে, শরণার্থীদের মধ্যে মুখ্যত নমশূদ্ররাই রাস্তার মিছিলে শামিল হচ্ছেন। বর্ণহিন্দুদের এসব আন্দোলনে সক্রিয়তা ছিল কম। যদিও প্রাথমিকভাবে ইউসিআরসি গঠনকালে তাতে বর্ণহিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ক্রমে সংগঠনগুলোতে দলিত-নমশূদ্ররাই নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় চলে আসেন। যদিও এই নতুন নেতৃত্বকেও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের প্রভাব এড়িয়ে স্বতন্ত্র কোনো রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। দেশভাগ-পূর্ববর্তী বাংলায় তাঁদের যে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। শরণার্থী সংগঠনগুলো উদ্বাস্তুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানান বিষয়ে প্রতিনিয়ত সক্রিয় থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এ সময় আবর্তিত হচ্ছিল মূলত নির্বাচনী সমীকরণে। ফলে শরণার্থীদের রাজনীতিও ওই সমীকরণেই বাঁধা পড়ে। তাদের বর্ণবৈষম্য বিরোধিতার রাজনীতিও এ পর্যায়ে অনেকখানি দুর্বল হয়ে যায়।

বাংলা ভাগ-পূর্ববর্তী তফসিলি ধারায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান তৈরির চেষ্টা করায় যোগেন মণ্ডল এই সময়টিতে কী রকম বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন, তার একটি বিবরণ দিয়েছেন গবেষক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবে :

> ...অন্যান্য রিফিউজি নেতাদের তরফ থেকে যোগেনের প্রতি পাল্টা আক্রমণ ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ ও তীব্র। ১৯৫৮-এর ২৯ জুন বাগজোলা ক্যাম্পে সারা বাংলা বাস্তুহারা সমিতির (এসবিবিএস) এক সভায় নেতারা বর্ণভেদের প্রশ্ন তুলে রিফিউজিদের মাঝে বিভেদ তৈরির জন্য যোগেনের নিন্দা করেন। এরূপ নিন্দাকারীদের মধ্যে ছিলেন যোগেনের একদাকালীন সহযোগী হেমন্ত বিশ্বাসও। যাঁরা ১৯৫৮-এর ২৫ জুলাই বাগজোলা ক্যাম্পে যোগেনের সভা বানচালেরও চেষ্টা করেন এবং তাঁকে বাংলা ভাগের জন্য অভিযুক্ত করেন। একই বছরের একই মাসে ২৪ পরগনার হাবরায় আশরাফাবাদ ট্রানজিট ক্যাম্পে আরেক সভায় শিলিগুড়ির অনিল সিংহও যোগেন কর্তৃক শুধু তফসিলিদের নিয়ে পৃথক রিফিউজি সংগঠন সৃষ্টির

নিন্দা করেন এবং পুনরায় ইউসিআরসিতে ফিরে এসে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন-সংগ্রামের আহ্বান জানান। তবে একই সভায় সিপিআইয়ের নদী কর তফসিলি ও বর্ণহিন্দুদের মাঝে বিভেদ তৈরি করে রিফিউজি আন্দোলনকে দুর্বল করার দায়ে যোগেনকে অভিযুক্ত করেন।...[১২]

সত্যাগ্রহ পরবর্তীকালে কারামুক্ত হয়ে যোগেন মণ্ডল 'পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ' নামে পৃথক একটি সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেষ্টা করছিলেন কিছুদিন ধরে। ১৯৬১ সালের ৭ জানুয়ারি তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং দমদম জেলে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁর সমর্থনে অনেক উদ্বাস্তু নেতা আমরণ অনশনের ডাক দেন এবং ১২ দিনের অনশন শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে যদিও এ সময় ক্রমে তিনি ভারতে চলে যাওয়া পূর্ব বাংলার তফসিলি উদ্বাস্তুদের প্রধান নেতায় পরিণত হচ্ছিলেন, কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে মোটেও সফল ছিলেন না। কারণ, তফসিলি সম্প্রদায়ের দ্বিধাবিভক্তি অনেকাংশেই ছিল অনতিক্রম্য। তা ছাড়া নমশূদ্রদের বিরাট সংখ্যাকে ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু প্রমথরঞ্জন ঠাকুরেরা কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করছিলেন, তারও প্রভাব পড়েছিল নির্বাচনে। বিধান চন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন প্রমথ ঠাকুর। ফলে তফসিলিদের মাঝে তাঁর প্রভাব বাড়ছিল। ১৯৬২-এর রাজ্য নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে হাঁসখালী কেন্দ্র থেকে সিপিআইয়ের জগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে প্রায় তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে বিজয়ী হন। পরে লোকসভারও সদস্য হন। অন্যদিকে যোগেন মণ্ডল অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজের জন্য 'নিরাপদ' কোনো নির্বাচনী এলাকা গড়ে তুলতে পারেননি। বাংলা ভাগ যে দলিত-নমশূদ্রদের রাজনৈতিক সমাবেশ শক্তি নিঃশেষ করে দেবে, সেটাই ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে যোগেন মণ্ডল বলতেন এবং তার যথার্থতাই প্রমাণিত হয় পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নির্বাচনী পরাজয়গুলোতে।

পশ্চিমবঙ্গে ফেরার পরপরই প্রথমে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বালিগঞ্জ-বেনেপুকুর আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত হন যোগেন মণ্ডল। পরে ১৯৬২ সালে বাগদা কেন্দ্রেও পরাজিত হন। তবে ১৯৬২-এর নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। কংগ্রেসের মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ভোটের ব্যবধান ছিল ১০ হাজার।

এসব নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি নিজেকে তফসিলি নেতা হিসেবে নয়, বরং অনেকাংশে শরণার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর

সমর্থনে কিছু দলিত সংগঠন যেমন কাজ করেছিল, তেমনি শরণার্থীদের বর্ণহিন্দু প্রভাবিত কিছু সংগঠনও তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু তফসিলি ভোটব্যাংক অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ায় যোগেন মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের বিপক্ষে বিজয়ী হতে পারছিলেন না।[১১৩] ফলে পশ্চিমবঙ্গ অধ্যায়ে যোগেনের তফসিলি রাজনীতির পুনর্গঠন প্রচেষ্টা সফল ছিল বলা যায় না।

তবে এর মধ্যেও পুরোনো আদর্শিক অবস্থানে অটল ছিলেন তিনি। যার পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে উল্লেখিত গবেষণাসূত্রে পাওয়া নিম্নোক্ত পুলিশি প্রতিবেদনে:

> Shri Jogen Mandal has been spreading class and caste.....[hatred] openly in camps. In Bolpur and Uttartilpara camp meetings on 23rd and 24th February [1958], he openly accused caste Hindu employees and caste Hindu people for sending refugee families to Madhya Pradesh outside West Bengal. He accused Govt. to make West Bengal a caste Hindu **state.**[১১৪]

এরূপ রাজনীতি নিয়েই ১৯৬৩ সালে আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত রিপাবলিকান পার্টি[১১৫] পশ্চিমবঙ্গ শাখা প্রতিষ্ঠা করেন যোগেন এবং সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হন। এই দল থেকেই ১৯৬৪ সালে তিনি হাসনাবাদ থেকে উপনির্বাচনে অংশ নেন এবং পরাজিত হন। জীবনের সর্বশেষ নির্বাচনও (১৯৬৭ সালে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে) তিনি রিপাবলিকান পার্টি থেকেই করেছিলেন এবং প্রায় ৮৫ হাজার ভোট পেয়েও সিপিএমের রণেন্দ্রনাথ সেনের কাছে পরাজিত হন।[১১৬] কংগ্রেস ও সিপিআইয়ের সঙ্গে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৮৪ হাজার ৬৪৪ ভোট পেয়ে তৃতীয় হন তিনি। এই নির্বাচনের পরের বছরই সে সময়কার সরকার ভেঙে যায়। নতুন নির্বাচনের আয়োজন শুরু হলে তারই প্রস্তুতিকালে ১৯৬৮-এর ৫ অক্টোবর ৬৪ বছর বয়সে বনগাঁয় মারা যান যোগেন মণ্ডল। এভাবেই দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় পরিচয়নির্বিশেষে নিপীড়িত বর্গের মানুষের প্রকোর এক বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের সক্রিয়তার অবসান ঘটে। ১৯০৪-এ পূর্ব বাংলার আগৈলঝাড়া থেকে যে সংগ্রামী জীবনের শুরু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির সেই প্রবক্তা এভাবে হঠাৎই সাংগঠনিকভাবে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিদায় নিয়েছিলেন। তবে জীবনের শেষবেলায়ও তিনি তাঁর দলিত ও বহুজনবাদী রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হননি। আবার জীবদ্দশায় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলোতে তিনি বিজয়ী হয়েছেন, এমনও বলা যায় না। প্রতিপক্ষ শক্তির বহুমুখী বিরোধিতা বারবারই তাঁকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।[১১৭]

# যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদী রাজনীতির পরিণতি ও প্রাসঙ্গিকতা

বাংলার নিম্নবর্গের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে যোগেন মণ্ডল শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি, যেভাবে ভারত ও পাকিস্তানে চূড়ান্ত বিচারে জিতেছিলেন গান্ধী ও জিন্নাহ। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা-উত্তর সাত দশকেও পাকিস্তান ও ভারত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। যোগেনের 'নিপীড়িত শ্রেণির হিস্যা' খোঁজার রাজনীতিও সাতচল্লিশ-পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছিল। এটাকে আমরা বলতে পারি দক্ষিণ এশিয়ায় দলিত-মুসলমান বহুজনবাদী রাজনীতির নির্ধারক এক পরাজয়, যে রাজনীতির গোড়ার কথা ছিল 'বহুজনের অংশগ্রহণমূলক' সমাজ।

তবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার নিম্নবর্গ যোগেনের সেই বহুজনবাদী রাজনীতিরই সন্ধানে আছে আজও। এমনকি হালের রোহিঙ্গা সংকটও দক্ষিণ এশিয়ায় বহুজনবাদী রাজনীতির অনুপস্থিতিজনিত সংকটের কথাই জানান দিচ্ছে। একই শূন্যতার কথা বলছে ভারতের কাশ্মীর, পাকিস্তানের বালুচ, শ্রীলঙ্কার তামিল, নেপালের মধেস, বাংলাদেশের চাকমা-সাঁওতালরা।

যোগেন মণ্ডলের মৃত্যু ভারতে যেমন বর্ণহিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদদের একাংশকে স্বস্তি দিয়েছিল, তেমনি করাচি থেকে তাঁর পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়াও পাকিস্তানে নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী এলিট নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করেছিল। তারই ফসল বাংলাদেশ। হয়তো প্রায় সেই কারণে আজও বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে যোগেন মণ্ডল বিস্মৃত।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুদের বিবেচনায় যোগেনের কারণেই পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল। যে জন্য তাঁরা যোগেনকে বলতেন 'যোগেন আলী মোল্লা'। পাকিস্তানের জিন্নাহ-পরবর্তী মুসলিম লীগ মনে করে, ১৯৫০-এ

যোগেনের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতাতুল্য। আবার পশ্চিমবঙ্গে তাঁর 'শেষ যুদ্ধ'-এর ব্যর্থতার ফল হয়েছিল এ রকম, প্রায় চল্লিশ বছর সেখানে 'বামপন্থী' সরকার থাকার পরও দলিত-নমশূদ্র ও মুসলমানদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মুসলমানদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার উদাহরণ দিয়ে এরূপ বঞ্চনাকে যৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত নমশূদ্রদের ক্ষেত্রে অনুরূপ বঞ্চনার যুক্তি গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ২০১১-এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে শিডিউল কাস্টদের মাঝে শিক্ষার হার প্রায় ৭০ শতাংশ, যা এই রাজ্যের গড় সাক্ষরতার হারের চেয়েও ২ শতাংশ বেশি। নয় কোটি জনসংখ্যার এই রাজ্যে সংখ্যার হিসাবে তারা প্রায় ২৪ শতাংশ। রাজ্যের সমগ্র হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

বাংলাদেশে বেসরকারি হিসাবে পৌনে দুই কোটি হিন্দু জনসংখ্যার মাঝে ৮০ ভাগই শিডিউল কাস্ট। এই হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ মিলে এখনো প্রায় পৌনে তিন কোটি শিডিউল কাস্ট মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের সর্বশেষ পার্লামেন্টে (২০১৪-১৮) ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিলেন ১৯ জন। অর্থাৎ মাত্র ৫.৪২ শতাংশ। দীর্ঘদিন মন্ত্রিসভায় জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে কোনো পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন না। পরে অবশ্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সর্বশেষ পার্লামেন্টে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন মাত্র একজন। সামগ্রিক চিত্রে দলিত-নমশূদ্রদের হিস্যা স্বাভাবিকভাবেই আরও কম হবে।

বাংলাদেশের মতোই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নীতিনির্ধারণী স্তরেও এরূপ একটি শিক্ষিত বড় জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত হিস্যার ঘাটতি রয়েছে। বরং সেখানে পূর্বের মতো বর্ণহিন্দুদেরই আধিপত্য চলছে, যারা চাইছে একটা 'homogenised nation'। কিন্তু আর্থসামাজিক পরিসরে নিম্নবর্গের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা ও ঘৃণা বলছে 'homogenised nation'-এর ধারণাটি একটি প্রতারণা মাত্র।

আবার বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব এবং দলগুলো হিন্দু বনাম মুসলমান যে বিভাজনরেখা তৈরি করতে তৎপর, তারও লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সমাজে দলিত-নমশূদ্রকেন্দ্রিক বঞ্চনাকে গুরুত্বহীন করা এবং 'মুসলমানদের মোকাবিলায়' নমশূদ্র পরিচয় মুছে 'একক হিন্দু অবস্থান' তৈরি করা। এর বিপরীতে বামপন্থীদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শতাড়িত শ্রেণিধারণাভিত্তিক সমাবেশীকরণ

প্রক্রিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদভিত্তিক শোষণের বাস্তবতাটি অগ্রাহ্য করে। তাঁদের সেই রাজনীতিও বাস্তবে আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ নেই' বলে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের লেখক মনোশান্ত বিশ্বাসের ভাষায়, 'পুরোনো বামপন্থীদের মতো স্বাধীনতা-উত্তর বামপন্থীদের ধারণা ছিল, জাতিগত বিভেদ-বঞ্চনা-বর্ণশ্রেণী মানসিকতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তি বিপ্লব ও শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে।'[১১] কিন্তু বাংলা থেকে বর্ণভিত্তিক রাজনীতির বিদায় ঘটেছে, এমনটি বলা যায় না। উল্লিখিত গবেষক দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দীর্ঘ শাসনের শেষলগ্নে (২০০৬-১১) রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন প্রায় ৪১ শতাংশ, অথচ জনসংখ্যায় তাদের হিস্যা মাত্র ২ শতাংশ। পরবর্তী সরকারের সময়ও ৪৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৪ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ। অথচ জনহিস্যায় তা একজনের বেশি হওয়ার কথা নয়। তবে এ সময় থেকে মুসলমান ও দলিতদের হিস্যা বাড়তে শুরু করে। ১৯৭৭ সালে পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখন একজনও দলিত মন্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু তাদের ৩৪ বছরের শাসনের পর তৃণমূল প্রথম সরকার (২০১১ সালে) গড়েই শিডিউল কাস্ট কমিউনিটি থেকে সাতজন এবং শিডিউল ট্রাইব থেকে দুজনকে মন্ত্রী করে। একইভাবে মুসলমানদের উপস্থিতিও মন্ত্রিসভায় বাড়ছে। ২০০৬ সালে বামফ্রন্টের শেষ মন্ত্রিসভায় মুসলমান ছিলেন চারজন। আর তৃণমূলের পরবর্তী মন্ত্রিসভায় এই সংখ্যা ছিল ছয়। যদিও এখনো পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কোনো দলিত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি এবং মুসলমান ও দলিতদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার নজির খুবই কম। চাকরির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধাঁচের বঞ্চনাই বহাল আছে। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের হার ছিল ২৫.২৫ শতাংশ। আর ২০০৬ সালের সাচার কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী এই রাজ্যের সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের হার ২.১ শতাংশ। অর্থাৎ জনসংখ্যার হিস্যা অনুযায়ী যা হওয়ার কথা, তার ১২ ভাগের ১ ভাগ। আবার এই ২.১ শতাংশ চাকরিও পাচ্ছে মূলত উর্দুভাষী মুসলমানরা। নিম্নবর্ণীয় বাঙালি মুসলমানরা নয়।[১৯]

এভাবে নানারূপে বর্ণবাদ টিকে আছে[২০] বলেই বাংলা ভাগকালে হারিয়ে ফেলা নমশূদ্র-পৌণ্ড্র-বাগদি-মুসলমান ঐক্যের 'রাজনীতির পরিসর'টি নতুন করে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্ণরা,[২১] যা পশ্চিমবঙ্গে শিডিউল কাস্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

এটা কেবল পশ্চিমবঙ্গেই ঘটছে না। বাকি ভারতেও দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-আরএসএস পরিবার একটি বিষয়কে খুবই ভয় পাচ্ছে এবং আড়াল করতে চাইছে তা হলো 'দলিত-মুসলিম ঐক্য'।[১২২] বস্তুত ভারতে এখন দলিত-মুসলমান ঐক্যকে ভিত্তি করে নিম্নবর্গের সমাবেশশক্তি বৃদ্ধির যে আয়োজন চলছে, তা প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭-পূর্ব যোগেনেরই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তত্ত্ব।

সমগ্র ভারতে জনসংখ্যার ৩২ শতাংশে হিস্যা (দলিত ১৭ শতাংশ এবং মুসলমান ১৫ শতাংশ) হয়েও দলিত ও মুসলমানরা স্বাধীনতার সাত দশক পরও সবচেয়ে অনুন্নত বর্গ হয়ে আছে ভারতে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা কার্যত সেখানে দলিত ও মুসলমানদের উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি।

কিন্তু বাংলাদেশ যোগেন মণ্ডলকে কেন ভুলে গেছে? বাংলাদেশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিসত্তার প্রথম সফল রাষ্ট্র। সাতচল্লিশে এখানে 'শ্রেষ্ঠ' আর 'তফসিলি'রা পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত করেছিল আর একাত্তরে একই জোট পাঞ্জাবি কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-মৈত্রী-সামাজিক ন্যায়বিচার বাংলাদেশের ব্যবহারিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হতে পেরেছে, এমনটি বলা যায় না। মানুষের প্রতিনিধি বাছাই, সংঘবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও এখানে অধরাই রয়ে গেছে বলা যায়। যদিও যোগেনের জাতিঘৃণার প্রতি বৈরিতার শিক্ষা যে বাংলাদেশের ধমনিতে এখনো বহমান, তার একটা বড় নজির প্রায় ১০ লাখ উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের সচেতন ঐকমত্য।

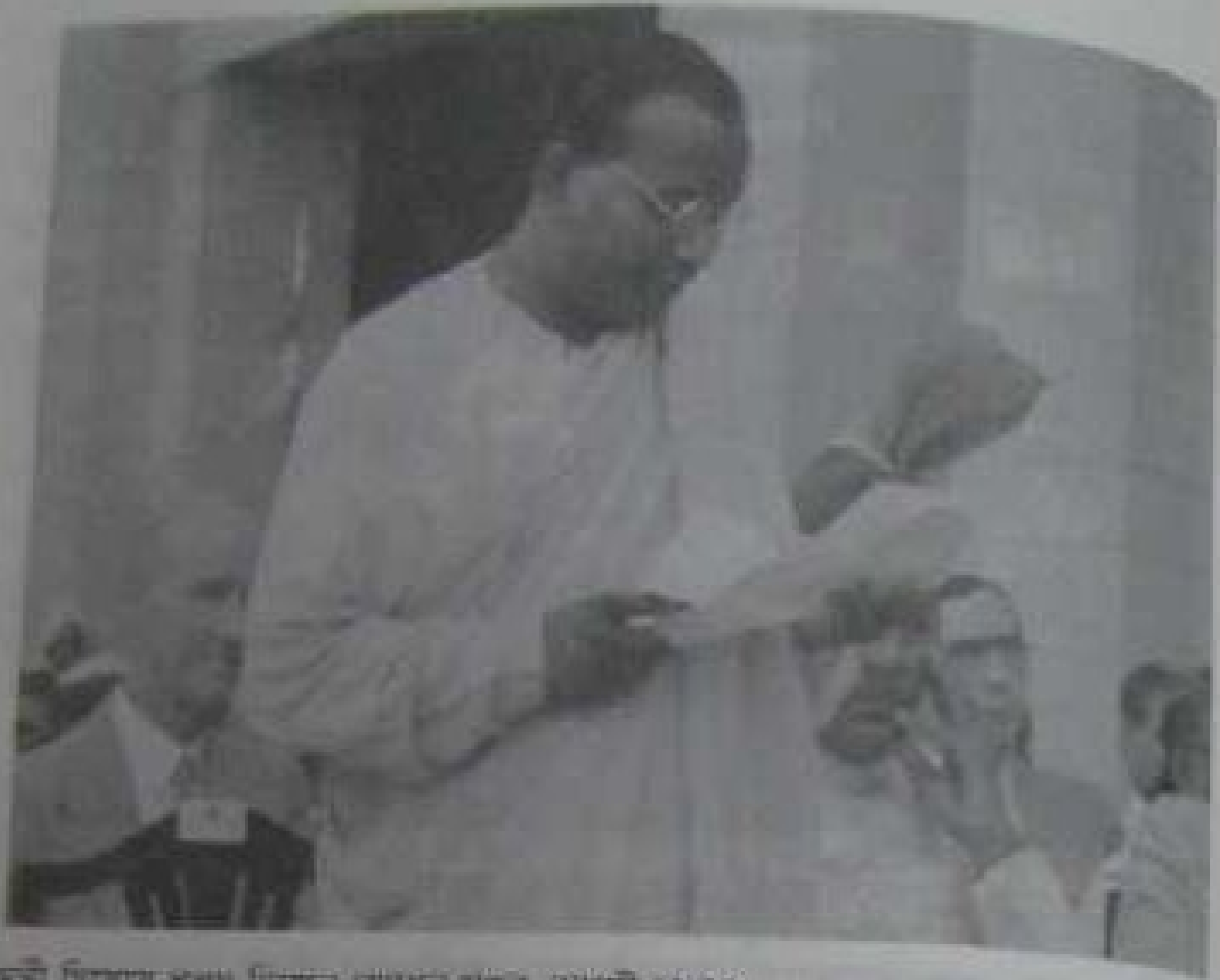
সাতচল্লিশে এবং একাত্তরে দু-দুটি সফল সংগ্রাম বলে দেয়, যোগেনের স্বপ্নের ইনক্লুসিভ রাজনীতির প্রতি এ দেশের নিম্নবর্গের বিরাট অংশের সমর্থন ছিল। কিন্তু শাসক এলিটদের কারণেই সাতচল্লিশ-পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান এবং একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের 'প্রবল' জাতিসত্তাগুলো আজও 'অপর'কে ধারণ করে নতুন সমাজ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়নি। অর্থাৎ এখনো কার্যত শাসক-এলিটরা তাদের শাসনাস্ত্র হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বহাল রাখতে পারছে। সে জন্যই আজও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'বহুজনবাদী' রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়নি। এই রাজনৈতিক-দার্শনিক বোঝাপড়া ছাড়া বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এগোতে পারবে বলে মনে হয় না।



আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন মণ্ডলের বৈঠক, তারিখ : অজ্ঞাত



পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতিরূপে যোগেন মণ্ডল, আগস্ট ১৯৪৭



মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন যোগেন মণ্ডল, আগস্ট ১৯৪৭



পাকিস্তানে 'যোগেন মণ্ডল দিবস'-এ তাঁকে সংবর্ধনা, জুন ১৯৪৯

সংযুক্তি : এক

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক তফসিলি জাতি ফেডারেশনের প্রথম মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর

১৯৪৫

প্রতিনিধিবৃন্দ ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ

যে পরম কারুণিক জগদীশ্বরের অসীম দয়ায় আজ আমরা এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক তফসিলি জাতি মহাসম্মেলনে সমবেত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছি, সেই সর্বশক্তিমান পরমপিতাকে সর্বাগ্রে প্রণতি ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। তারপর স্বজাতি সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ, বিভিন্ন জেলার তফসিলি জাতি ফেডারেশনের কর্মকর্তাগণ ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ এই ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করিয়া আমাকে যে সম্মানের অধিকারী করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তফসিলি জাতিগণের জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে এই সম্মেলনের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সভাপতি পদে আপনাদের মনোনয়ন আমি যে নতশিরে বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার কারণ, আমি আপনাদের সেবক; আপনাদের কর্মপ্রেরণা, উপদেশ, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব এই মহাসম্মেলনের কার্যাবলী সুচারুরূপে পরিচালনায় সর্বদা আমার সহায়ক হইবে—এই দৃঢ়বিশ্বাস আমার আছে। জাতিসেবার এই মহাযজ্ঞে শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন, ইহাই প্রার্থনা।

যে কয়েকটি বিশেষ কারণে এই মহাসম্মেলন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত তফসিলি জাতির জাগরণের ইতিহাসে গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাংলার তফসিলি জাতীয়গণ সর্ববিষয়ে অগ্রগামী। আবার বাংলা প্রদেশের মধ্যে ফরিদপুর জেলা—বিশেষত গোপালগঞ্জ মহকুমা—সর্ববিষয়ে অগ্রগামী। জনসংখ্যায়, আর্থিক অবস্থায়, উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষিত হারে এই মহকুমা তফসিলি জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। গোপালগঞ্জ শহরের ন্যায় এ প্রদেশে অপর কোনো শহর নাই, যেখানে তফসিলি শ্রেণিভুক্ত এত অধিকসংখ্যক উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী আছেন। রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের দিক দিয়াও এই মহকুমাকে প্রথম স্থান দেওয়া চলে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব দাস মহাশয়ই তফসিলি জাতির মধ্য হইতে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই মহকুমায় তফসিলি জাতীয় নমশূদ্রগণের জাতীয় আন্দোলন সমস্ত প্রদেশের জাতিসমূহের মধ্যে জাগরণের অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। অদ্যাপি শিক্ষায়, অর্থে, জ্ঞানে, গরিমায়, শৌর্যে-বীর্যে এই মহকুমার তফসিলিগণ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এহেন গোপালগঞ্জে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের সর্বপ্রথম অধিবেশন আহ্বান করিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন।

শুধু বাংলা প্রদেশ নহে, সমগ্র ভারত তথা সমগ্র পৃথিবী যখন এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন, সর্বদেশের রাষ্ট্রগগন যখন অশান্তি ও অনিশ্চয়তার ধূম্রজালে আবৃত, এমন সময়ে তফসিলি জাতির এই মহাসম্মেলন বাস্তবিকই প্রকৃত গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইউরোপের মহাসমরানল এখনও প্রজ্জ্বলিত, এশিয়া হতে শত্রুর কামান গর্জন এখনও নিস্তব্ধ হয় নাই। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের ভীতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সকল দেশ ও জাতি তাহাদের নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যাপৃত। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকার্যে দেশ ও রাষ্ট্রনায়কগণ এখন হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছে। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি যখন স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন, তখন চিরবঞ্চিত তফসিলি জাতিসমূহ কি প্রকারে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহাদের সংখ্যা ও প্রয়োজনানুসারে ন্যায্য দাবি এবং অধিকার অর্জন করিতে পারে, তাহা নির্ধারণ করার প্রয়োজনবোধে এই মহাপরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে তফসিলি জাতির

তফসিলি জাতিসমূহের এই সম্মেলন আহ্বান যে অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্বের সমস্ত দেশ ও জাতি এক মহাসংকটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতির তাপোত্তাপ ফলাফল হইতে কোনও জাতি রেহাই পায় নাই, তফসিলি জাতিও নহে। কিন্তু পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ আনন্দের সহিত এ কথা ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, ইউরোপে এবং এশিয়ায় ইংরেজের তথা মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হইয়াছে। বাংলার দ্বারদেশ হইতে [illegible] যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা ব্রহ্মদেশাভ্যন্তরে অপসারিত হইয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশু অবসান ও মিত্রশক্তির জয়লাভ আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। বাংলা তথা ভারতের তফসিলি জাতিসমূহ সর্বতোভাবে মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিয়াছে ও করিতেছে। মিত্রশক্তির বিজয়-গৌরবে এই যুদ্ধাবসানে ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হইবে, তা একরূপ সুনিশ্চিত। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা, সাপ্রু কমিটির সুপারিশ ও প্রস্তাবিত সান ফ্রান্সিসকোর শান্তি সম্মেলন, ইহারই পূর্বাভাস। কী পন্থা ও নীতি অবলম্বনে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে তফসিলি জাতিসমূহের রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক দাবি এবং অধিকার সব দিক দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হইতে পারে, তদ্বিষয় নির্ধারণ করাই এই সম্মেলনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত ধর্ম ও সমাজের ব্যাপারে আমাদের প্রতি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে অবিচার অত্যাচার চলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতিকার ব্যবস্থাও আমরা করিতে চাই। অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক আরোপ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন স্মরণাতীতকাল হইতে তফসিলি জাতির প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার চালাইয়া আসিয়াছে তাহা স্মরণে আনিয়া আপনাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত করিতে চাহি না। মানুষ হইয়াও মানুষের সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া এই জাতির কোটি কোটি নরনারী কীরূপ হীন ও দুর্দশাময় জীবনযাপন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে সে চিত্র মানসপটে উদিত হইলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। আজ স্মরণ করুন, আপনাদের পূর্বপুরুষগণের কথা—যাহারা গায়ের রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, জোঁক পোকের কামড় খাইয়া, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনাবাদী জমি, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছিল, যাহারা গো পালন করিয়া দেশবাসীকে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি যোগাইত, যাহারা দারুণ শীতের প্রকোপে জর্জরিত হইয়াও রাত্রির অন্ধকারে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী

ও সমুদ্রবক্ষে, ঝিল ও বিলে বাঙ্গালির উপাদেয় খাদ্য মৎস্য আহরণ করিত, যাহারা নিজেদের জীবনের মমতা বিসর্জন দিয়া জমিদার ও ধনিকের ধন, মান ও প্রাণ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিত, তাহারাই এই দেশে অস্পৃশ্য ও অমানুষের পর্যায়ে পতিত হইলো—চিরলাঞ্ছিত, নিপীড়িত, উপেক্ষিত এই সর্বহারার দল দেশের উচ্চবর্ণের নিকট প্রাপ্ত হইলো ঘৃণা, বিদ্বেষ, অপমান ও উৎপীড়ন। হায়রে দুর্ভাগা দেশ। হায়রে জাত্যভিমানী সমাজ-শাসক! একবারও বুঝিলে না—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে!
মানুষের অধিকারে, বঞ্চিত করেছ যারে
তোমরা মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে
ঘোর ব্যবধান।
অপমানে আজি তোর হতে হবে তাহাদের
সবার সমান।

হিন্দু মহাসভা বা ব্রাহ্মণ সভার নেতাকে আমি আজ মহামনীষীর এই বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

শুধু বর্ণহিন্দুর অত্যাচারেই এই জাতির দুর্দশার শেষ হয় নাই। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচারের সুযোগ লইয়া খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ আমাদের লাখ লাখ ভাইবোনকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া আমাদের জাতির অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছে। লাখ লাখ নিপীড়িত নরনারী সমাজের অত্যাচারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ নানাভাবে নিঃসহায় তফসিলি সম্প্রদায় দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে আমাদের কোনও অধিকার নাই, অর্থের দিক দিয়াও আমরা নিঃস্ব। একমাত্র অবশিষ্ট রাষ্ট্রক্ষেত্র, সেখানেও আমরা সর্ব অধিকারে বঞ্চিত। ধর্ম, সমাজ ও অর্থ বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভের দ্বারা জাতীয় উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। একমাত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে অধিকার অর্জন দ্বারাই আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভবপর। তদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমাদের বরেণ্য নেতা ডক্টর আম্বেদকর ১৯৩১-৩২ সালের বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে তফসিলি জাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের নিমিত্ত মি. গান্ধী প্রমুখ বহু শক্তিশালী ভারতীয় নেতার বিরুদ্ধে যে কঠোর সংগ্রাম করেন, তাহারই ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে তফসিলি জাতির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়। তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা

হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, একটি কার্যকর শক্তিশালী সঙ্ঘ ব্যতীত রাষ্ট্রক্ষেত্রে তফসিলি জাতির প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার অর্জন সম্ভবপর নহে। তাই বিগত ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নাগপুরে আহূত ঐতিহাসিক অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস কনফারেন্সে নিখিল ভারত তফসিলি জাতি ফেডারেশন গঠিত হয়। উক্ত ফেডারেশনের অধীনে বাংলার ন্যায় অন্যান্য প্রদেশেও প্রাদেশিক ফেডারেশনসমূহ গঠিত হইয়াছে। বড়ই সুখের বিষয় যে, বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রাদেশিক ফেডারেশনের অধীনে জেলা ও মহকুমা ফেডারেশন, এমনকি বহুসংখ্যক থানা ও ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র তফসিলি জাতির মধ্যে আসিয়াছে এক অভূতপূর্ব জাগরণ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সকলেরই মুখে দুইটি মাত্র বাণী—ফেডারেশন ও ডক্টর আম্বেদকর। যদিও ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলন হিসাবে এইটিই প্রথম অধিবেশন, তথাপি এই সম্মেলনে বাংলার দূরদূরান্তর হইতে অসংখ্য প্রতিনিধি ও জনসমাগম বাংলায় ফেডারেশনের জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। ফেডারেশনই যে বাংলায় তফসিলি জাতির একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

আপনারা অবগত আছেন যে, নিখিল ভারত তফসিলি জাতি ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় জীবনে তফসিলিভুক্ত জাতির জন্য একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা অর্জন এবং প্রয়োজন, সংখ্যানুপাত ও গুরুত্ব অনুসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভ। আমরা চাই কেন্দ্র এবং প্রদেশে, আইনসভার উভয় পরিষদে, মন্ত্রিমণ্ডলীতে, জেলা বোর্ডে, জেলা স্কুল বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, লোকাল বোর্ডে ও ইউনিয়ন ও ডিএস বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে তফসিলি জাতির প্রয়োজন ও সংখ্যানুপাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ। সর্বত্র পৃথক নির্বাচন প্রথায় তফসিলি জাতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। তফসিলি জাতির মধ্যে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিবছরের বাজেটে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ থাকিবে। বিভিন্ন শিল্প শিক্ষায় বিশেষ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভারতের বাইরে ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তফসিলি জাতির শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থেরও বরাদ্দ থাকিতে হইবে। গভর্নমেন্ট খাসমহলে যেসব চাষের উপযোগী জমি আছে ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ তফসিলি জাতির মধ্যে বন্দোবস্তমূলে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। যেসব স্থানে তফসিলি জাতির গৃহ, ভূমি ও বসবাসের সুবিধা নাই তৎ স্থানে

উহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ জমি প্রদান করত নতুন গ্রাম পত্তনে আর্থিক সাহায্য ও সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তফসিলি জাতি হইতে সদস্য মনোনীত করিতে হইবে। কেন্দ্রে ও প্রদেশে শাসন বিভাগে, বিচার বিভাগে, পুলিশ বিভাগে ও অন্যান্য বিভাগীয় সরকারি চাকুরিতে উচ্চ ও নিম্ন পদে তফসিলি জাতির জন্য একটি সাম্প্রদায়িক হার নির্ধারিত থাকিবে এবং উক্ত নির্ধারণমূলে তফসিলিগণের জাতি হইতে একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিতে হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তফসিলি জাতির উপরোক্ত দাবিগুলো যাহাতে স্বীকৃত হয়, তদ্বিষয়ে আন্দোলন চালাইবার জন্যই এই ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। এই ফেডারেশনই ভারতের তফসিলি জাতির আট কোটি নরনারীর একমাত্র মুখপাত্র। বহু সহস্র বৎসরের নিপীড়িত এই অস্পৃশ্য কোটি কোটি নরনারীর জন্য সর্ববিধ মুক্তিসংগ্রামে এই ফেডারেশন বদ্ধপরিকর।

তফসিলি জাতির যে মুক্তিসংগ্রামে এই ফেডারেশন বদ্ধপরিকর হইয়াছে, উহাতে জয়লাভ করিতে হইলে একটি বিষয় আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দাবিদাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার উপর। এই স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান লক্ষ্য। যে সংরক্ষণ নীতি ও বিশেষ সুবিধার দাবি আমরা করিতেছি, আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নাই হইলে উহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। ফেডারেশন যে পরিমাণে শক্তিশালী হইবে, আমাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার দাবি সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। মি. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রতিক বাঁটোয়ারায় তফসিলি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ব্যবস্থা পরিষদে, মন্ত্রিসভায় ও সরকারি চাকুরিতে আমরা বহু সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছি।

বন্ধুগণ, এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়াতেই একশ্রেণির বর্ণহিন্দুর তথা হিন্দু মহাসভার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। যুগযুগান্তরের অস্পৃশ্য নির্যাতিত জাতিসমূহ শিক্ষায়, অর্থে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিবে, ইহা তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। তাই তফসিলি জাতিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য ফেডারেশনের সর্ববিধ প্রচেষ্টায় হিন্দু মহাসভা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই জাতির উপরে যাহারা এত দিন অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছে, এই জাতির জাগরণে তাহারাই আজ সমধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে আর বেশি দূর যাইতে হইবে না। যে সম্মেলনে আজ আপনারা

সমবেত হইয়াছেন, সেই সম্মেলন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তজ্জন্য কোনোরূপ হীনকার্য করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। মিথ্যা প্রচারকার্যের দ্বারা আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সরলমতি জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে তাহারা কোনও চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই। দিনের পর দিন বিভিন্ন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের স্তম্ভে কত মিথ্যা সংবাদই না প্রচারিত হইয়াছে। একই সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি একাধিকবার প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে। আপনারা জানেন, হিন্দু মহাসভা যখন কনফারেন্স করে তখন কংগ্রেসী হিন্দুগণ, মুসলমানগণ বা তফসিলিগণ তাহাতে বাধা দেয় না। কিন্তু তফসিলি জাতির কনফারেন্স পণ্ড করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা কোনও পন্থাবলম্বনই বাকি রাখে নাই। নিজদিগকে পর্দার আড়ালে রাখিয়া নানারূপ স্বার্থের প্রলোভনে তফসিলি জাতির মধ্য হইতে কতিপয় এমএলএ-কে হিন্দু মহাসভার দলে ভিড়াইয়া, তফসিলি জাতি ফেডারেশন ও তাহার নেতা ডক্টর আম্বেদকরের বিরুদ্ধে কত না হীন প্রচারকার্য চালাইয়াছে। পথভ্রষ্ট, স্বজাতিদ্রোহী সেই সব এমএলএ-কে তফসিলি জাতি কখনও ক্ষমা করিবে না। আপনারা হয়তো প্রশ্ন করিবেন, হিন্দু মহাসভার এরূপ করিবার কারণ কী? ইহার কারণ এই, হিন্দু মহাসভা বুঝিয়াছে, নিখিল ভারত তফসিলি জাতি ফেডারেশনের পতাকাতলে তফসিলি জাতিসমূহ সংঘবদ্ধ হইলে উহাদের ন্যায্য দাবি প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। উহাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইলে উহাদিগকে পদদলিত করিয়া রাখার সুযোগ থাকিবে না। উহাদের উপর নেতৃত্ব করাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বাংলার আড়াই কোটি হিন্দুর সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা ৩০ লাখ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের ভোগ করা অসম্ভব হইবে। তাই ছলে, বলে, কৌশলে যে কোনও উপায়েই হউক, তফসিলি জাতিসমূহকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া রাখাই হিন্দু সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। উক্ত তিনটি বর্ণের লোক— যাহারা আর্যগণের বংশধর বলিয়া দাবি করে, তাহারা এ দেশের কে? ইতিহাসে পাওয়া যায়, এমন একদিন ছিল, যখন আর্যগণ বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। কিন্তু বেদোত্তর কালে দস্যু তস্করের মতো ইহারা এই দেশে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি ও অর্থবলে আজ তাহারা এই দেশের মালিক সাজিয়া বসিয়া আছে—আর এই দেশেরই প্রকৃত মালিক যাহারা ছিল, তাহাদিগকে শাসন, শোষণ ও নিপীড়নে অস্পৃশ্য অমানুষে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। শতাব্দীর লাঞ্ছনা ও অজ্ঞতায় তফসিলি জাতির আত্মচেতনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আজ আর তাহারা সেই পর্যায়ে নাই। আজ তাহাদের জাগরণ আসিয়াছে। আজ

তাহাদের চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহারা নিজের ন্যায্য অধিকার অর্জন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের মতো মানুষ হইয়া সসম্মানে বাঁচিতে চায়। এদেশের ধনসম্পদ যাহা কিছু তাহারাই উৎপন্ন করে। এ দেশ তাহাদের জন্মভূমি—এ দেশ তাহাদেরই। আজ আমি বলিব, জাত্যাভিমানী, অহংকারী বর্ণহিন্দুগণ! তোমরা অচিরেই এ দেশ ত্যাগ করো। আর যদি এ দেশে বাস করিতে হয়, তবে সর্বক্ষেত্রে আমাদের সমান অধিকার মানিয়া লও। এখনও সময় আছে, ভেদনীতি অবলম্বনে তফসিলি জাতির একতা নষ্ট করিতে অগ্রসর হইও না। তাহাদের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না। জাগরণের যে দুর্দমনীয় অনুপ্রেরণা তফসিলি জাতির মধ্যে আসিয়াছে, তাহার উত্তালবেগে তোমাদের কূটকৌশল ও হীন প্রচেষ্টা সমস্তই তুচ্ছ তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে।

ভদ্র মহোদয়বৃন্দ! আপনারা সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, হিন্দু মহাসভা তফসিলি জাতিস্বার্থের ঘোর বিরোধী। হিন্দু মহাসভা মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট গোঁড়া বর্ণহিন্দুর প্রতিষ্ঠান। বাংলায় তথা ভারতে হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করিবার কোনও অধিকার মহাসভার নাই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও প্রায় তদ্রূপ, ইহাও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত। কংগ্রেস এখনও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবি করিতে পারে না। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা আজ পর্যন্ত ভারতের আট কোটি শ্রমিক ও কৃষক তফসিলি নরনারীর রাজনৈতিক আর্থিক বা সামাজিক উন্নতিকল্পে কিছুই করে নাই। মি. গান্ধীর হরিজন আন্দোলন একটা মস্ত বড় ধাপ্পাবাজি ব্যতীত কিছুই নহে। ইহা আসল সমস্যা এড়াইবার একটা অভিনব কৌশল মাত্র। হরিজন আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া আমাদিগকে জগৎ সমক্ষে হেয়, এমনকি মানবসমাজের অযোগ্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আট কোটি মানুষকে এই নামে আখ্যায়িত করিয়া গান্ধীজী নিতান্ত সংকীর্ণতা ও অমহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মানবতার অমর্যাদা করিয়াছেন।

হরিজন আন্দোলনের নামে যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থে নিয়োজিত হইয়াছে। হরিজন ফান্ডের কর্মকর্তাগণ সকলেই বর্ণহিন্দু ও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে চায়। আবার অধুনা হিন্দু মহাসভাও (ব্রাহ্মণ মহাসভা) স্বাধীনতার ধুয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসকে স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ভারতের

ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা— যাহাতে পূর্বের ন্যায় চিরদিন এই দেশের জনসাধারণ অর্থাৎ শ্রমিক, মজুর ও কৃষককুলের উপর তাঁহাদের অবাধ শোষণ চলিতে পারে। সুতরাং কংগ্রেসের স্বাধীনতা মানে কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় গোঁড়া হিন্দুর রাজত্ব। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার আমলে তফসিলিগণ হাজার বছর পূর্বে যেরূপ অস্পৃশ্য ও নির্যাতিত ছিল, তদ্রূপ হইবে। অতএব, তফসিলি জাতির প্রত্যেক নরনারী এই দুটি প্রতিষ্ঠান হইতে সর্বদা দূরে থাকিবেন।

বন্ধুগণ, ব্রিটিশদের পক্ষ হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস যে প্রস্তাব নিয়া কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তফসিলি জাতিসমূহ পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। আমরা ভারতের আট কোটি তফসিলি জনগণের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে এরূপ মারাত্মক ভুল না করেন। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত একটা আপোষ রফা হইয়া গেলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না। তফসিলি জাতির ন্যায় দাবি ও অধিকার স্বীকার না করিয়া তাহাদের অসম্মতিতে যেকোনও শাসনতন্ত্রই ভারতে চালু করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, তাহা কিছুতেই কার্যকরী হইবে না। ভারতের আট কোটি তফসিলি নরনারী প্রয়োজন হইলে বুকের রক্ত দিয়া উহা প্রতিরোধ করিবে। আমরা কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ধাঙড়, মেথর ও আড়ুদার ভাইবোনের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত সভ্যজগৎ মুহূর্তও চলিতে পারে না। আমরা আমাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়াছি।

ভারতের মুসলিম লীগই যে মুসলমানগণের প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইহা সকলে স্বীকার করেন। মুসলিম লীগ ক্রমশঃ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট নবাব নাইটদের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যেদিন মুসলিম জনগণের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন তফসিলি জাতি ফেডারেশনের ন্যায় মুসলিম লীগও ভারতের শোষিত শ্রেণির স্বার্থের জন্যই সংগ্রাম করিবে। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানও তফসিলি জাতির ন্যায় অনুন্নত ও শোষিত। মুসলিম নেতারাও ইহা উপলব্ধি করেন। বিখ্যাত ফ্লাউড কমিশনের মেম্বারগণের মধ্যে মুসলমান ও তফসিলি জাতির সদস্যগণ বাংলায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে মত দিয়াছেন কিন্তু পুঁজিবাদী হিন্দু ও জমিদার প্রতিনিধিগণ উহার ঘোর বিরোধিতা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতের

ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে লীগনেতা কায়েদে আজম মি. জিন্নাহ তফসিলি জাতির ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া মি. গান্ধী বা হিন্দুসভা নেতাদের সহিত হাত মিলাইবেন না।

সাপ্রু কমিটির সুপারিশে তফসিলি জাতির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইলেও গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদের সভ্য নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা থাকায় উহা তফসিলি জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। সান ফ্রান্সিসকোর বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতের আট কোটি তফসিলি জনগণের একমাত্র নেতা বিশিষ্ট গঠনতান্ত্রিক পণ্ডিত মাননীয় ডা. বি. আর. আম্বেদকরকে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একান্ত উচিত ছিল। উহা না করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ভাষণ পরিসমাপ্তির পূর্বে আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। যদিও প্রায় সর্বশেষে আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া এইটি আমার সর্বপ্রধান এবং প্রথম আলোচ্য বিষয়। বিগত ১৯৪১ সালের সেনসাস বা লোকগণনায় তফসিলি জাতির প্রতি যে নিষ্ঠুর অবিচার করা হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। তফসিলি জাতির লক্ষ লক্ষ লোককে তফসিলি না লিখিয়া কেবল হিন্দু লেখা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দুসভা বহু অর্থ খরচ করিয়া অসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিল। অধিকন্তু লোকগণনার জন্য যেসব উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল, তারা অধিকাংশই হয় বর্ণহিন্দু, না হয় মুসলমান। মুসলমান অফিসারগণ কাহারা তফসিলি ও কাহারা বর্ণহিন্দু, তাহা অনেক ক্ষেত্রে বুঝিতে পারেন নাই। আর বর্ণহিন্দু অফিসারগণ অধিকাংশস্থলে ইচ্ছা করিয়াই তফসিলি জাতির লোককে শুধু হিন্দু বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তফসিলি জাতির পক্ষে এই অন্যায় কার্য প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা অপেক্ষা ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যায় মুসলমান ও হিন্দুগণের শতাধিক বৃদ্ধি পাইলেও তফসিলি জাতির জনসংখ্যা মোটেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। আমরা ১৯৪১ সালের লোকগণনা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারি না। আমাদের এই আপত্তি সত্ত্বেও যদি ১৯৪১ সালের সেনসাস ভিত্তি করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্র রচিত হয়, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সালে যে হারে বাড়িয়াছে, তফসিলি জাতির লোকও সেই হারে বাড়িয়াছে—ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ পুনরায় তফসিলি জাতির লোকগণনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এই অতি ন্যায্য দাবিটুকু মানিয়া লইতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।

বর্তমান বাংলায় ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার শাসন সম্পর্কে দুই-একটি কথা না বলিলে চলে না। অবশ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ৯৩ ধারা প্রয়োগের জন্য গভর্নর বাহাদুর বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। অনন্যোপায় হইয়াই তিনি শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। জনপ্রিয় কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিতান্ত অপকৌশলে অতর্কিত ভোটে পরাজিত করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিদের শাসনের পরিবর্তে ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তনের জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদিগকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেশদ্রোহী মীর জাফর, জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ প্রভৃতির সহিত তুলনা করা চলে। বস্ত্রাভাব দূরীকরণ ও বস্ত্রের চোরাবাজার বন্ধ করিবার নিমিত্ত নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর আদেশে বিগত ২৫ মার্চ তারিখে কলিকাতা পুলিশ বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়ের দোকানে খানাতল্লাশ করিয়া বহু সহস্র গাঁইট কাপড় প্রাপ্ত হয় এবং উহা আটক করে। ঐ সব বস্ত্র নিয়মিতভাবে কলিকাতা ও মফস্বলে অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু উহাতে মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের স্বার্থে ঘোরতর আঘাত লাগায় উহারা মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য আইন পরিষদের বিরুদ্ধ দলের নেতাদের শরণাপন্ন হয়। তাঁহারা এই সুবর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া মাড়োয়ারীর অর্থবলে অভীষ্টসিদ্ধির লোভে তৎপর হইয়া উঠেন। ফলে ২৯ মার্চ বেলা তিন ঘটিকায় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে পরিষদ গৃহে এক অভিনব দৃশ্য দেখা যায়। দর্শকের গ্যালারি ও বিরুদ্ধ দলের নেতা মৌলভী এ কে ফজলুল হক সাহেবের কামরায় ও সর্বত্র রঙ্গীন পাগড়ী পরিহিত অসংখ্য মাড়োয়ারী ঘোরাফেরা করিতে থাকে। আর বিরুদ্ধ দলের আসনগুলো সম্পূর্ণ ভর্তি দেখা যায়। কারণ, সেই দিনই প্রায় ২২-২৩ জন মুসলমান ও তফসিলি জাতি এমএলএ গভর্ণমেন্ট পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ দলে যোগ দেয়। অতঃপর বিরুদ্ধপক্ষ কৃষি খাতে বরাদ্দের কোনরূপ আলোচনা না করিয়াই ভোট গ্রহণের দাবি করে—যেহেতু তখনও গভর্ণমেন্ট দলের সভ্যেরা অনেকেই পরিষদে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরিষদের স্পিকার সাহেবও বিরোধী দলের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন। এরূপ অতর্কিত ভোট গ্রহণের ফলে অল্প কয়েক ভোটে গভর্ণমেন্টের পরাজয় ঘটে। তৎপর দিবসে স্পিকার নির্দেশ দেন যে, মন্ত্রিমণ্ডলী পরিষদে আর কোনও কার্য করিতে পারিবেন না। ফলে ৯৩ ধারার প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

আপনারা জানেন, স্যার নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডলীতে তফসিলি জাতির তিনজন মন্ত্রী ছিলেন। যাহা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। মন্ত্রিমণ্ডলী তফসিলি জাতির শিক্ষার জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা রেকারিং গ্রান্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

সরকারি চাকুরিতে তফসিলি প্রার্থীগণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে চাকুরি লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি এই জেলার দুই জনসহ অনেক তফসিলি এমএলএ মন্ত্রী হওয়ার লোভে ও অন্যান্য কারণে সরকার-বিরোধী দলে যোগদানকরত হিন্দুসভা নেতাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহাদের আত্মঘাতী নীতি ও স্বজাতিদ্রোহিতা বরদাস্ত করার শক্তি অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি বিধান তফসিলি সমাজ অবশ্যই করিবেন—এ দৃঢ়বিশ্বাস আমার আছে। ইহারা আপনাদেরই ভোটে সভাপদ লাভ করিয়াছেন। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলার প্রতিশ্রুতি ইহারা সকলেই দিয়াছেন। কিন্তু আজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পাইয়া ইহারা যখন আপনাদের স্বার্থে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তখন ইহার প্রতিবিধান অবশ্যই আপনারা করিবেন। সমাজ আজ সচেতন হইয়াছে। সমাজকে ফাঁকি দেয়া বা প্রতারণা করা কাহারও পক্ষে আজ সম্ভব নয়। জনগণের সেবা না করিয়া আরাম কেদারার রাজনীতিতে আপন নেতৃত্ব বজায় রাখার সুদিন আর নাই।

আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এই ভাষণের কলেবর আর বৃদ্ধি করা যায় না। যাহাদের অপরিসীম উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলায় তফসিলি জাতি ফেডারেশনের বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে, তাহাদের কথা এখনও আমার বলা হয় নাই। আমি তফসিলি জাতির সেই সবুজ, তরুণ, কাঁচাবুদ্ধি, নিঃস্বার্থ সমাজসেবী আমার প্রিয় যুবক ও ছাত্র বন্ধুগণের কথা বলিতেছি। আমার নেতা ও ফেডারেশনের নামে জাতির ক্ষুদ্র এক সেবক আমার আহ্বানে তাহারা যে অপূর্ব সাড়া দিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত কোনও দেশের কোন জাতির আন্দোলনের ইতিহাসে মিলিবে না। উহাদের অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা, অপরিমেয় স্বজাতিবাৎসল্য ও জাতিসেবায় অপূর্ব স্বার্থত্যাগই আমাকে জাতিসেবার কার্যে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। আমি জানি, উহারাই জাতির প্রকৃত সেবক, উহারাই আমাদের আশা-ভরসার স্থল। সহস্র বছরের বঞ্চিত ও নিপীড়িত কোটি কোটি নরনারীর সর্ববিধ মুক্তিসংগ্রামে এই তরুণের দলই হইবে বিজয়ী যোদ্ধা। উহাদেরই নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এই মহাসম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইল। উহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। আমাদের ফেডারেশন ও উহার নেতা ড. আম্বেদকরের প্রতি উহাদের আনুগত্য চিরদিন অম্লান থাকুক—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ, পরিশেষে আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন—তফসিলি জাতির মুক্তির জন্য আমরা যে সংগ্রাম

আরম্ভ করিয়াছি, তাহা জয়যুক্ত করিতে আপনারা সকলে ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হউন। প্রত্যেক ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায় ও জেলায় ফেডারেশন গঠন করুন। তফসিলি জাতির প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি ফেডারেশনের সভ্য শ্রেণিভুক্ত হউন। ফেডারেশনের বার্তা বহন করিয়া জাতিকে সংঘবদ্ধ করিবার দায়িত্ব ও ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ফেডারেশন পরিচালিত দুইখানি বাংলা ও ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাংলা পত্রিকাখানির নাম *জাগরণ* এবং ইংরেজিখানির নাম *পিপলস হেরাল্ড*। ফেডারেশনের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। তফসিলি জাতির বর্তমান নেতৃস্থানীয় দুই একজন ও তফসিলি জাতির পথভ্রষ্ট কতিপয় এমএলএ যাঁহারা এখনও ফেডারেশনে যোগদান করেন নাই—আমি তাহাদিগকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি, তাহারা যেন অচিরে ফেডারেশনে যোগদান করিয়া জাতি সেবার কার্যে সহায়তা করেন।

বন্ধুগণ, আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—আমরা উন্নতি চাই, মুক্তি চাই। অতীতে যাহাই থাকি না কেন, আর অবজ্ঞাত থাকিব না। আর লাঞ্ছনা সহ্য করিব না। কাহারও অপেক্ষা ছোট থাকিব না। কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিব না। অপরেও যেমন মানুষ, আমরাও তেমন মানুষ। অপরের এই দেশের সুখসমৃদ্ধিতে যেমন অধিকার, আমাদেরও তেমন অধিকার। আমাদের বাহুতে বল আছে, বুকে সাহস আছে, দেশের ধনসম্পদ আমরাই সৃষ্টি করি, আমরা ছোট কিসে? আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির অভাবে রাষ্ট্রে অধিকার না থাকায় মুষ্টিমেয় স্বার্থপর সমাজশাসক আমাদিগকে কৌশলে ছোট করিয়া রাখিয়াছে। যে বিধান মানুষে মানুষে পার্থক্য ও ভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করে, সে বিধান আমরা আর মানিব না। সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলিয়া নিয়া তফসিলি সম্প্রদায়গুলোকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হইবে। জাতির সেবা, জাতির উন্নতির বিধান ও জাতির মুক্তির সংগ্রামে আত্মবলিদানই হইবে তফসিলি জাতির ধর্ম।

সংযুক্তি : দুই

# যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগপত্র[১২৩]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজের অবস্থা উন্নয়নের জন্য আমার হৃদয়ের ব্যর্থতার পর চরম হতাশা এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আপনার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করছি। মনে হয় আমার জানানো উচিত কেন ভারতীয় উপমহাদেশের এই ক্রান্তিকালে এই সিদ্ধান্ত নিলাম।

এক

পদত্যাগের পিছনের কারণগুলো বলার আগে, আমি মনে হয় মুসলিম লীগের সাথে আমার সহযোগিতাকালে কী কী ঘটেছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বলা উচিত। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে লীগের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সাথে কথা হয়। আমি তাদের সাথে বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে কাজ করতে সম্মত হই। ১৯৪৩ সালের মার্চে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতনের পর ২১ জন নমশূদ্র সদস্যের প্রত্যক্ষ সম্মতিতে তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৩-এর এপ্রিলে আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আমাদের সমর্থনের পিছনে কিছু শর্ত ছিল। যেমন, মন্ত্রিসভায় তিনজন নমশূদ্র মন্ত্রী নিয়োগ, নমশূদ্রদের লেখাপড়ার উন্নয়নে ৫ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান এবং সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রচলন করা।

দুই

এসব শর্তের বাইরেও মুসলিম লীগকে সহায়তার পেছনে আমার কিছু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, বাঙালি মুসলমানদের সাথে নমশূদ্রদের অর্থনৈতিক

স্বার্থের মিল রয়েছে। মুসলমানেরা ছিল মূলত কৃষক-শ্রমিক, অস্পৃশ্যরাও তাই। মুসলমানদের একটি অংশের মতো নমঃশূদ্রদের একটি অংশও ছিল জেলে। দ্বিতীয়ত: তারা উভয়েই ছিল লেখাপড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। আমাকে বোঝানো হয়েছিল, লীগ এবং এর মন্ত্রিসভার সাথে আমার সহযোগিতা বিশাল পরিসরে আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। এই পদক্ষেপসমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাকে আমলে না নিয়ে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদদের উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি-সৌহার্দ্য আরও মজবুত হবে, এমনটিই বলা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যায়, খাজা নাজিমুদ্দিন তার মন্ত্রিসভায় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ৩ জন সদস্যকে নিয়েছিলেন। তিনি আমার এই সম্প্রদায় থেকে ৩ জনকে সংসদ সচিব হিসেবেও নিয়োগ দিয়েছিলেন।

## সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা

তিন

মার্চ ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের পর জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী সেই মাসেই লীগের সংসদ নেতার পদ পান এবং এপ্রিল ১৯৪৬-এ লীগের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফেডারেশনের টিকিটে কেবল আমিই আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হই। আমি জনাব সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সেই বছরের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগ কর্তৃক 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালিত হয়। আপনার জানা আছে, শেষ পর্যন্ত এটা এক হত্যাযজ্ঞে রূপ নেয়। হিন্দুরা লীগের মন্ত্রিসভা থেকে আমার পদত্যাগ দাবি করে। আমি প্রতিদিন চিঠির মাধ্যমে হুমকি পেতে থাকি। আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি আমার পথে অবিচল থাকি। তদুপরি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের পত্রিকা জাগরণ-এর মাধ্যমে নমঃশূদ্রদের কাছে আবেদন জানাই তারা যেন নিজেদের কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের এই রক্তাক্ত লড়াই থেকে দূরে রাখে। আমার অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশীগণ যেভাবে আমাকে ক্রুদ্ধ হিন্দুদের হাত থেকে নিরাপত্তা দেন, তা আমি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি।

কলকাতা হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৪৬-এর অক্টোবরে শুরু হয় নোয়াখালীর দাঙ্গা। সেখানে শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে (নমঃশূদ্রসহ) হত্যা করা হয় এবং জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। হিন্দু মহিলারা অপহরণ

এবং ধর্ষণের শিকার হন। আমার সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি ত্রিপুরা ও ফেনী যাই। দাঙ্গাপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করি। হিন্দুদের দুর্দশা আমাকে গভীরভাবে পীড়িত করে, আমি মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে যাই। কলকাতার বিশাল হত্যাযজ্ঞের পরপর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে এক তোড়জোড় আয়োজিত হয়। শুধু আমার চেষ্টা দ্বারাই কংগ্রেসের পক্ষের চারজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সদস্য এবং চারজন অস্পৃশ্য সদস্যের সমর্থন যোগাড় করা সম্ভব হয়, যা ব্যতীত মন্ত্রিসভার পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

চার

১৯৪৬-এর অক্টোবর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে আমার কাছে প্রস্তাব আসে ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে একটি পজিশন গ্রহণ করার জন্য। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়। বেশ কিছু সময় দোদুল্যমান থাকার পর আমি এই শর্তে রাজি হই যে, আমার নেতা ড. বি আর আম্বেদকর যদি আমাকে ওই জায়গায় না চান তবে আমাকে পদত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হবে। ভাগ্যক্রমে তিনি লন্ডন থেকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাঁর অনুমতি প্রদান করেন। আইনসভার সদস্য হিসেবে যোগদানের লক্ষ্যে দিল্লিতে রওনা দেওয়ার আগে আমি তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে রাজি করাতে সক্ষম হই যে তিনি আমার স্থানে দুইজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিবেন। তিনি নমশূদ্রদের ফেডারেশন গ্রুপ থেকে দুইজনকে সংসদ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিতেও সম্মত হন।

পাঁচ

আমি ১৯৪৬ সালের ১ নভেম্বর মধ্যবর্তী সরকারে যোগ দেই। এক মাস পর কলকাতাতে যাই। তখন সোহরাওয়ার্দী আমাকে জানালেন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কথা; বিশেষ করে গোপালগঞ্জের কিছু জায়গাতে যেখানে নমশূদ্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন সেই অঞ্চলগুলো পরিদর্শনে যেতে এবং মুসলিম ও নমশূদ্রদের মাঝে সমঝোতা করতে। সেইসব এলাকায় নমশূদ্ররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি কয়েক ডজন সভা করে তাদের সেই পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনি। একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে সে এলাকা মুক্তি পায়।

ছয়

করার মাস পর ব্রিটিশ সরকার তাদের ৩ জুনের 'ঘোষণা' (১৯৪৭) প্রদান করে যাতে ভারত ভাগ বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনার অবতারণা করা হয়। পুরো দেশ, বিশেষ করে সমগ্র অমুসলিম ভারত এতে হতবাক হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে আমি সব সময় শুধু দরাদরির অংশ হিসেবেই দেখে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের অন্যায় প্রভাবের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ক্ষোভ ন্যায়সংগত। কিন্তু এ বিষয়েও আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার যে পাকিস্তানের জন্ম সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কখনোই করবে না। বরং, এটা কেবল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধিই করবে। পাশাপাশি আমি এই ধারণা পোষণ করতাম, পাকিস্তানের সৃষ্টি মুসলিমদের অবস্থা উন্নয়ন করবে না। দেশভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আসবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং উভয় দেশের জনগণের দুর্দশা যা অনির্দিষ্টকাল না হলেও বহুদিন ধরে চলতে থাকবে। আমার আশঙ্কা ছিল পাকিস্তান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এবং অনুন্নত দেশগুলোর একটিতে পরিণত হবে।

## লাহোর ঘোষণা

সাত

আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, পাকিস্তানকে ইসলামী শরিয়ত এবং নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে একটি শতভাগ 'ইসলামী' রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে, যা এখন করা হচ্ছে। আমার অনুমান ছিল মার্চ ২৩, ১৯৪০-এ মুসলিম লীগের গৃহীত ঘোষণা অনুসারে সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটানো হবে। অন্যান্য জিনিসের মাঝে ওই ঘোষণায় ছিল: ১. ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি অবস্থিত স্থানসমূহ প্রয়োজনীয় ভূমির আদলবদলের মাধ্যমে এমনভাবে ভাগ করা হবে যেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মতো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে স্বাধীন-সার্বভৌম একাধিক রাষ্ট্র গঠন করা যায়; এবং ২. এসব অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য স্বার্থ-অধিকার রক্ষার নিমিত্তে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানে যথেষ্ট, কার্যকর ও আবশ্যিক নিরাপত্তা প্রদানের ধারা যুক্ত করা হবে। এই ঘোষণার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল যা, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বের মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ২টি স্বাধীন

রাষ্ট্র গঠন করা হবে, খ. এই রাষ্ট্রগুলোর অংশসমূহ হবে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত, গ. সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত নিশ্চয়তা তাদের স্বার্থ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট হবে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তা ভূমিকা রাখবে এবং ঘ. সংবিধানে সংখ্যালঘুদের এই সাংবিধানিক সুবিধাদি সংখ্যালঘুদের নিজেদের দ্বারাই নির্বাচিত হবে। গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১১ আগস্ট ১৯৪৭-এ দেয়া ভাষণ এই ঘোষণা ও লীগের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস আরো পোক্ত করে। এই ভাষণে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষকেই সমানভাবে বিবেচনায় দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন এবং তাদের আহ্বান করেন এটা মনে রাখতে যে, তারা সবাই পাকিস্তানী। ইসলামিক রাষ্ট্র ও তার মুসলিম নাগরিকদের সার্বক্ষণিক হেফাজতে সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম এবং 'জিম্মি'দের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদের প্রশ্নই ছিল না। এটা প্রতীয়মান হয় যে আপনার জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে কায়েদ-ই-আজমের ইচ্ছা ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হিসেবে এই সকল ওয়াদার বরখেলাপ করা হচ্ছে যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতি ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## বাংলা ভাগ হলো

আট

এই প্রসঙ্গে এটা বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ভাগের সময় আমাকে প্রবল বিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই ধরনের প্রচারণার ফলে আমি শুধু বিরোধিতার সম্মুখীন হই নাই, হয়েছি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অবজ্ঞার শিকার। হতাশার সাথে আমি সেই সব দিনের কথা চিন্তা করতে চাই যখন ভারতবর্ষের ৩২ কোটি হিন্দু আমাকে হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের শত্রু বানিয়ে ছিল। আমি ছিলাম পাকিস্তানের প্রতি একান্ত অনুগত এবং অবিচলভাবে আস্থাশীল। আমি চিন্তা করতাম পাকিস্তানের ৭০ লক্ষ হিন্দু দলিতের কথা, যারা ছিল আমার সাথে। তারাই আমাকে সর্বদা সাহস যুগিয়েছে এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

নয়

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর আপনি পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আমি এর একজন সদস্য ছিলাম। খাজা নাজিমুদ্দিন

পূর্ব বাংলার জন্য একটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আগস্টের ১০ তারিখে আমি করাচিতে খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে কথা বলে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভায় নমশূদ্রদের মধ্যে থেকে ২ জনকে নিয়োগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি কিছুদিন পরেই তা করবার আশ্বাস দেন। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে আপনার, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ববাংলার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের সাথে আমার অপ্রীতিকর এবং হতাশাজনক আলাপচারিতা চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে খাজা নাজিমুদ্দিন এই-সেই অজুহাতে ব্যাপারটিকে এড়িয়ে চলছেন তখন আমি একইসাথে ক্রুদ্ধ এবং অধৈর্য হয়ে পড়লাম। আমি এই ব্যাপারে পাকিস্তান মুসলিম লীগে এবং এর পূর্ব বাংলা শাখার সভাপতিদ্বয়ের সাথেও আলোচনা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ঘটনাটি আপনার গোচরে আনি। আপনি সাগ্রহে আমার উপস্থিতিতে আপনার বাসায় খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় ফিরে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত একজনকে মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হন। তার আশ্বাসের ব্যাপারে ইতোমধ্যে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠায় আমি কাজটি সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময়সূচী জানতে চাই। আমি জোর দাবী জানাই এই ব্যাপারে এক মাসের মধ্যে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য, অন্যথায় পদত্যাগের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আপনারা দুজনেই এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু হায়, সম্ভবত আপনার মুখের কথা আপনার মনের প্রতিচ্ছবি ছিল না। খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর ওয়াদা পালন করেননি। জনাব নুরুল আমিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমি তাঁর কাছেও বিষয়টি নিয়ে যাই। তিনিও সেই পুরাতন এড়িয়ে চলার নীতি চালিয়ে যান। ১৯৪৯-এ আপনার ঢাকা আগমনের প্রাক্কালে যখন আমি ব্যাপারটি আবারো আপনার গোচরে আনি, আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘুমন্ত্রী অবশ্যই নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। আপনি আমার কাছে বিবেচনার জন্য দু-তিনজনের নামও চান। আপনার চাওয়ার প্রতি সশ্রদ্ধ বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করে আমি আপনার কাছে পূর্ব বাংলা থেকে তিনজনের নাম সুপারিশপূর্বক চিঠি পাঠাই। আপনি ঢাকা থেকে ফেরার পর আমি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে আপনি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন এবং 'নুরুল আমিনকে দিল্লী থেকে ফিরতে দাও' কেবল এই মন্তব্যটুকু করেন। কিছুদিন পর আমি আবার বিষয়টি তুলে ধরি, কিন্তু আপনি তা এড়িয়ে যান। তখন আমি এই উপসংহারে আসতে বাধ্য হই যে, আপনি বা নুরুল আমিন কেউই চান না

যে পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভায় কোনো নমশূদ্র ব্যক্তি নিয়োগ পাক। এ ছাড়াও আমি দেখতে পারছিলাম, জনাব নুরুল আমিন এবং পূর্ব বাংলা লীগের কিছু নেতা নমশূদ্র ফেডারেশন সদস্যদের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছিলেন। আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, আমার নেতৃত্ব এবং বিশ্বাস জনপ্রিয়তাকে খারাপ চোখে দেখা হচ্ছে। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে নমশূদ্রদের স্বার্থ সংরক্ষণে আমার স্পষ্টবাদিতা, তদারকি এবং আন্তরিক কার্যকলাপ পূর্ব বাংলা সরকার এবং লীগের কিছু নেতার মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব কিছুর পরোয়া না করে আমি পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করি।

## হিন্দুবিদ্বেষী নীতি

দশ

বাংলা ভাগের প্রসঙ্গ উঠতেই নমশূদ্ররা এর বিপজ্জনক ফলাফলের কথা অনুমান করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর কাছে তারা কিছু প্রতিনিধি পাঠালে তিনি সানন্দে একটি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেন, যাতে বলা ছিল নমশূদ্ররা ভোগ করছে এমন কোনো সুবিধা ও অধিকারই কর্তন করা হবে না, বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। সোহরাওয়ার্দী এই আশ্বাস কেবল ব্যক্তিগতভাবেই দেননি, লীগ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও দিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ভারত ভাগের পরে, বিশেষ করে কায়েদ-ই-আজমের মৃত্যুর পর থেকে নমশূদ্ররা কোনো বিষয়েই তাদের প্রাপ্য বুঝে পায়নি। আপনার স্মরণে থাকবে যে আমি সময়ে সময়ে এই অস্পৃশ্য জাতিগোষ্ঠীর দুর্দশার চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরেছি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অকার্যকর প্রশাসনের চিত্র আপনার কাছে ব্যাখ্যা করেছি। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ দাখিল করেছি। অসার ভিত্তির উপর নির্ভর করে পুলিশের বর্বর নৃশংসতার ঘটনাসমূহও আমি আপনার নজরে এনেছি। পূর্ববাংলার সরকার বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের একাংশের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির কথা আপনাকে জানাতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করিনি।

## কিছু ঘটনা

এগারো

প্রথম যে ঘটনা আমাকে মর্মাহত করে তা ঘটেছিল গোপালগঞ্জের দিঘারকুল গ্রামে। সেখানে স্থানীয় নমশূদ্রদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা মিথ্যা অভিযোগে গুজব রটিয়ে বর্বরতা চালায়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে একজন মুসলিম জেলে মাছ ধরতে জাল ছুড়ে মারে। একজন নমশূদ্র একই উদ্দেশ্যে জাল ছুড়ে মারে। এই নিয়ে দুইজনের ভিতর কথা-কাটাকাটি হয়। মুসলিম যুবক গ্রামে গিয়ে মিথ্যা গুজব রটায় যে তাকে এবং এক মহিলাকে নমশূদ্ররা আক্রমণ করেছে। গোপালগঞ্জের উপ-জেলা প্রশাসক সে সময় নৌকায় করে সে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে অভিযোগ করলে তিনি কোন তদন্ত ছাড়াই সশস্ত্র পুলিশ পাঠান নমশূদ্রদের দমন করতে। তাদের সাথে স্থানীয় মুসলিমরা যোগ দেয়। তারা নমশূদ্র হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তাদের হামলায় বাড়িঘর ধ্বংস হয়, প্রচুর নারী-পুরুষ আহত হয়। শেষ সহায় সম্বলটুকু লুট করে নিয়ে যায় মুসলিমরা। এক হিন্দু মহিলা যিনি কি না ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, তাঁকে পিটিয়ে গর্ভপাত করে দেয় তারা। বিশাল এলাকাজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

বারো

হিন্দুদের ওপর পুলিশ দিয়ে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের পরের ঘটনা ঘটে ১৯৪৯ সালের শুরুতে। বরিশাল জেলার গৌরনদীর পুলিশ সুপারের অধীনে। পুলিশের একদল সোর্স তাদের প্রতিপক্ষকে কমিউনিস্ট বলে চালিয়ে দেয় পুলিশের কাছে। তারা এ-ও বলে ওই পক্ষ পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করবে। গৌরনদী থানার ওসি এই শুনে কোনও রকম সত্যতা যাচাই না করে হেডকোয়ার্টার থেকে পুলিশের রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন নিয়ে আসেন। পুলিশ বাহিনী বিশাল এলাকা অবরুদ্ধ করে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ চালায়। প্রচুর লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের কমিউনিস্ট সন্দেহে আটক করা হয়। তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। আমি ঘটনাটা জানতে পারি কারণ ঘটনাস্থল আমার গ্রামের বাড়ির কাছেই। আমি জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে জানাই এবং নির্দেশ দিই ঘটনা তদন্তের জন্য। কিন্তু আমার চিঠিতে কোন কাজ হয়নি। আমি তখন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ মহল—মানে আপনার কাছে ঘটনাটা জানাই। কিন্তু আপনি কোনও ব্যবস্থা নেননি।

## সামরিক বাহিনী দিয়ে মহিলাদের উপর নির্যাতন

তেরো

সিলেট জেলার হবিগঞ্জের নিরীহ হিন্দুদের উপর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। নিরীহ হিন্দু এবং মহিলাদের উপর নির্মম নির্যাতন চলে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এর শিকার হয়। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয় এবং তাদের বাড়িঘরে লুটপাট চলে। পুলিশের সাথে স্থানীয় মুসলমানরা যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে হিন্দু মহিলাদের নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। আমি আপনার কাছে এই ঘটনার কথাও রিপোর্ট করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি তদন্তের আশ্বাস দিয়েও এর কোনও সুরাহা করেননি।

চৌদ্দ

রাজশাহীর নাচোলে একটি ঘটনার কথা বলি। কমিউনিস্টদের দমনের নামে পাকিস্তানের পুলিশ স্থানীয় মুসলিমদের নিয়ে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদের সম্পদ লুটপাট করে। স্থানীয় সাঁওতালরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। তারা সেখানে তাদের উপর চালানো বর্বরতার কথা বলে।

পনেরো

খুলনা জেলার মোল্লারহাটের অন্তর্গত কালশিরা গ্রামে ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৯-এ ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নির্মম ও ঠান্ডা মাথায় ঘটানো এসব ঘটনার একটি উদাহরণ। সেদিন গভীর রাত্রে কালশিরা গ্রামের জনৈক জয়দেব ব্রাহ্মা-এর বাড়িতে সন্দেহজনক কমিউনিস্টদের খোঁজে চারজন কনস্টেবল হানা দেয়। পুলিশের আসার সংবাদে জনা ছয়েক তরুণ, কমিউনিস্ট বা সাধারণ, বাড়িটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাড়িতে ঢুকে জয়দেব ব্রাহ্মার স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালালে তার চিৎকার তার স্বামী এবং বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া তার কিছু সঙ্গীর কানে আসে। মরিয়া হয়ে তারা গৃহে পুনঃপ্রবেশ করে এবং চারজন কনস্টেবলকে কেবল একটি বন্দুকসহ পায়। সম্ভবত এই দৃশ্য তাদের প্ররোচিত করে এবং তাদের আঘাতে অস্ত্রধারী কনস্টেবলটি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তারা তারপর দ্বিতীয় কনস্টেবলের উপরও হামলা চালালে বাকি দুজন

সেখান থেকে পালিয়ে যেয়ে আশেপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং সফল হন। কিন্তু গ্রামবাসী এগিয়ে আসবার আগেই রাতের অন্ধকারে অপরাধীগণ মৃতদেহসহ গা ঢাকা দেয়। পরদিন বিকেলে খুলনার এসপি একদল মিলিটারি এবং আর্মড পুলিশসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ইতোমধ্যে অপরাধীগণ এবং বুদ্ধিমান প্রতিবেশীগণ ঐ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রামবাসীই তাদের নিজ ঘরেই রয়ে যান কারণ তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পরবর্তীকালে কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

এরপর এসপি, মিলিটারি ও আর্মড পুলিশ পুরো গ্রামজুড়ে নিরীহ গ্রামবাসীকে মারধর শুরু করে এবং আশেপাশের মুসলিমদের লুটপাটে প্ররোচিত করে। বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়, বহু হিন্দু নর-নারীকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। বাসাবাড়ির দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙচুর করা হয়, পূজোর স্থান অপবিত্র ও ধ্বংস করে দেয়া হয়। পুলিশ, মিলিটারি এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য কর্তৃক হিন্দু মহিলারা ধর্ষিত হন। এভাবে শুধু এক থেকে দেড় মাইল দৈর্ঘ্যের গ্রাম, এক বিরাট জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল কালশিরাই নয়, এর আশেপাশের বেশ কিছু নমশূদ্র গ্রামেও বাস্তবিক অর্থেই নরক নেমে আসে। কালশিরা গ্রামটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কখনোই কমিউনিস্ট কার্যকলাপের জন্য সন্দেহের তালিকাভুক্ত ছিল না। কালশিরা থেকে ৩ মাইল দূরবর্তী ঝালরডাঙ্গা গ্রামটি কমিউনিস্ট কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ঘটনার দিন এই গ্রামটিতে সন্দেহভাজন কমিউনিস্টদের ধরতে পুলিশের এক বিরাট বাহিনী হানা দিলে তাদের কিছুসংখ্যক পালিয়ে কালশিরা গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে আশ্রয় নেয়, যা তাদের কাছে নিরাপদ আত্মগোপনের স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

ষোলো

১৯৫০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমি কালশিরা এবং সংলগ্ন গ্রামগুলো পরিদর্শন করতে যাই। খুলনার পুলিশ সুপার এবং মুসলিম লীগের নেতারা আমার সাথে ছিলেন। আমি যখন কালশিরাতে পৌঁছাই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরানভূমি দেখি। পুলিশ সুপার জানান এখানে ৩৫০ বাড়ি ছিল। এর ভিতর মাত্র ৩টি বাড়ি ঠিক আছে। সব লুটপাট করা হয়েছে। আমি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান সচিব, পুলিশ প্রধান এবং আপনার কাছে ঘটনাটি জানিয়েছিলাম।

সতেরো

কালশিরার ঘটনা পশ্চিম বাংলার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে হিন্দুদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া হিন্দুরা সেখানে গিয়ে এই ভয়াবহতার কথা বললে সেখানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।

## ফেব্রুয়ারির হিংসার কারণগুলো

আঠারো

এটা স্বীকার করতেই হবে কালশিরার মতো পূর্ব বাংলার হানাহানির ফলে পশ্চিম বাংলাতেও সাম্প্রদায়িক হিংসা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মিডিয়ার খবর সেখানে আলোড়ন ফেলে। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক পরিষদে বাজেট অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা স্পিকারের কাছে অনুমতি চান কালশিরা এবং নাচোলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু অনুমতি মিলেনি। সদস্যরা প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন। প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দু সদস্যদের এই প্রতিবাদ মুসলিম মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং অফিসারদের রুষ্ট করে। সম্ভবত ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলার হিংসার কারণ এটাই।

উনিশ

১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা। ঢাকায় পূর্ব বাংলার সচিবালয়ে একজন মহিলাকে হাজির করা হয়। তার স্তন কাটা ছিল। বলা হয় সে কলকাতা দাঙ্গার শিকার। সাথে সাথে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। তারা মিছিল বের করে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক স্লোগান দেয়। মিছিল ক্রমে বড় হয় এবং একসময় এক মাইল লম্বা হয়। ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে মিছিল শেষ হয় দুপুর বারোটার দিকে। সেখানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারাও।

মজার বিষয় হচ্ছে যখন সচিবালয়ের কর্মকর্তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই মিছিল বের করেছিলেন, তখন পূর্ব বাংলার প্রধান সচিব পশ্চিম বাংলার প্রধান সচিবের সাথে সংবাদ সম্মেলন করছিলেন খোদ সচিবালয়ে—কীভাবে দুই বাংলার সাম্প্রদায়িক হিংসা কমানো যায় সেই বিষয়ে!

## সরকারি কর্মকর্তাদের মদদে লুটেরাদের হামলা

বিশ

দাঙ্গা শুরু হলো সেদিন দুপুর একটার দিকে। সারা শহরে একই সাথে। সারা শহরে হিন্দুদের হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। মুসলিমরা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই এইসব অপরাধ চালায়। হিন্দুদের স্বর্ণের দোকানে পুলিশের উপস্থিতিতেই লুটপাট চলে। এমনকি তারা লুটেরাদের দিকনির্দেশনাও দেয় কীভাবে লুটপাট করতে হবে সে বিষয়ে। আমি সেদিন অর্থাৎ ১৯৫০-এর ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এসে পৌঁছাই বিকাল পাঁচটার দিকে। কাছ থেকেই ঘটনাগুলো দেখি। যা দেখেছি এবং যা শুনেছি সত্যি তা ছিল মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়বিদারক।

একুশ

ঢাকার দাঙ্গার পেছনে প্রধান কারণ ছিল ৫টি :

— কালশিরা এবং নাচোলের ঘটনাসমূহের উপর আনীত দুটি মুলতবি প্রস্তাব গণপরিষদে প্রত্যাখ্যাত হলে হিন্দু প্রতিনিধিদের স্পর্ধিত ওয়াক আউটের জন্য হিন্দুদের শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে;

— সংসদীয় দলে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ এবং নাজিমুদ্দিন গ্রুপের মাঝে দিনকে দিন বেড়ে চলা মতবিরোধ ও পার্থক্য;

— পূর্ব বাংলার মন্ত্রণালয় এবং মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষের নেতাদের দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলার মিলনের সপক্ষে একটি আন্দোলন শুরু হতে পারে এমন ভয়ে ভীত ছিল। তারা এই মিলন রোধ করতে চাইছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে পূর্ব বাংলায় যেকোনো বড় আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়বে এবং সেখানে মুসলিমদের হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। উভয় বঙ্গে এরূপ দাঙ্গা দুই বাংলার মিলনকে অসম্ভব করে তুলবে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

— পূর্ব বাংলার বাঙালি এবং অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বৈরিতা ক্রমে বাড়ছিল। এটা রোধের একমাত্র উপায় ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়ানো। ভাষার ব্যাপারটিও এর সাথে জড়িত ছিল, এবং

— অবমূল্যায়নে অসম্মতি এবং ইন্দো-পাকিস্তান ব্যবসার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার ফলাফল পূর্ব বাংলায় অনুভূত হচ্ছিল, প্রথমে শহরাঞ্চলে, পরবর্তীকালে

গ্রামাঞ্চলেও। মুসলিম লীগের সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ এই আসন্ন অর্থনৈতিক ধস থেকে জনগণের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

## হতভম্বকারীর বর্ণনা—প্রায় ১০ হাজার মৃত্যু

বাইশ

ঢাকায় আমার নয় দিনের অবস্থানকালে আমি শহর ও শহরতলীর বেশির ভাগ দাঙ্গা আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়েছি। তেজগাঁওয়ের অন্তর্ভুক্ত মিরপুরেও আমার যাওয়া হয়েছে। আমি সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ট্রেনে শত শত নিরপরাধ হিন্দু হত্যার খবরে। ঢাকার দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে আমি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাকে অনুরোধ করি দাঙ্গা যেন জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ যেন তিনি অবিলম্বে জেলাগুলোর কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেন। ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে আমি বরিশাল শহরে পৌঁছে সেখানকার ঘটনা শুনে বিস্মিত হয়ে যাই। জেলা শহরে বেশ কিছু হিন্দু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়, প্রচুর হিন্দু নিহত হয়। আমি জেলাটির প্রায় সব দাঙ্গা আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছি। জেলা শহরের ৬ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এবং গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত কাশিপুর, মাধবপাশা, লাকুটিয়ার মতো জায়গাগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞের পরিমাণ দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। মাধবপাশা জমিদার বাড়িতে প্রায় ২০০ মানুষ নিহত হন, আহত হন আরো অন্তত ৪০ জন। মুলাদী নামক স্থানে যেন নরক নেমে আসে। স্থানীয় মুসলিমদের ও কিছু কর্মকর্তার ভাষ্য অনুসারে শুধু মুলাদী বন্দরেই ৩০০-এর বেশি লোক নিহত হয়। আমি মুলাদী গ্রামও পরিদর্শন করি এবং সেখানে মৃতদেহের কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখি। কুকুর এবং শকুন নদীর ধারে মৃতদেহ কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমাকে অবগত করা হয় যে সকল পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে হত্যার পর সমস্ত যুবতীদের দুর্বৃত্ত দলের হোতাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। রাজাপুরের অন্তর্গত কৈবর্তখালী নামক স্থানে ৬৩ জন নিহত হয়। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত হিন্দু বাড়িগুলোতেও লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, সেগুলোতে বসবাসকারীদের হত্যা করা হয়। বাবুগঞ্জ বাজারের সকল হিন্দু দোকানে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, বহু হিন্দু

নিহত হয়। বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়ার পর কম করে ধরলেও দেখা যায় শুধু বরিশাল জেলাতেই ২ হাজার ৫০০ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সব মিলিয়ে পূর্ববঙ্গে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার! সব খোয়ানো নারী-শিশুদের স্বজন হারাবার হাহাকারে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজের কাছেই জানতে চাইলাম 'ইসলামের নামে পাকিস্তানে কী ঘটতে চলেছে।'

## দিল্লি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকতার অভাব

তেইশ

মার্চের শেষভাগে বিশাল সংখ্যায় হিন্দুরা বাংলা ছাড়তে শুরু করে। মনে হচ্ছিল কিছুদিনের মধ্যেই সকল হিন্দু ভারতে চলে যাবে। ভারতে রণধ্বনি বেজে উঠল। পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ল। জাতীয় দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিল। ৮ এপ্রিলের দিল্লি চুক্তি অবশ্য এই অনুমিত দুর্যোগকে থামিয়ে দিতে পারল। ভয়ার্ত হিন্দুদের মনোবল পুনরুদ্ধারের আশায় আমি সারা পূর্ব বাংলা চষে বেড়ালাম। আমি ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা ও যশোরের অনেক স্থান পরিদর্শন করলাম। আমি বহু বড় বড় জনসমাবেশে হিন্দুদের নিকট আহ্বান জানাই তারা যেন তাদের সাহস ধরে রাখে এবং নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে না যায়। আমি আশা করেছিলাম যে, পূর্ব বাংলার সরকার এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ দিল্লী চুক্তির শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে। কিন্তু যতই সময় গড়াতে লাগল আমি উপলব্ধি করলাম এই দুই পক্ষের কেউই দিল্লী চুক্তির শর্তাদি পালনের ব্যাপারে প্রকৃতরূপে উৎসাহী নয়। দিল্লী চুক্তির শর্ত মোতাবেক একটি সিস্টেম দাঁড় করাতে পূর্ব বাংলার সরকার যে শুধু অক্ষম ছিল তাই নয়, সেই বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপও তারা নিতে চায় নি। দিল্লী চুক্তির পরপর বেশ কিছু হিন্দু তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে আসলেও ইতোমধ্যে মুসলিমদের দখলে চলে যাওয়া তাদের জায়গাজমি ও ঘরবাড়ি আর ফিরে পায়নি।

## মওলানা আকরম খাঁর প্রেরণায়

চব্বিশ

*মোহাম্মাদী* নামক একটি মাসিক পত্রিকার 'বৈশাখ' সংখ্যায় ছাপা হওয়া প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদকীয় পড়ে

লীগের নেতৃবৃন্দের মনোভাব সম্বন্ধে আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা আমি বুঝতে পারি। ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রী ড. এ এম মালিকের প্রচারিত প্রথম রেডিও বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি এই সম্পাদকীয় লিখেন। ড. মালিক বলেন, 'এমনকি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও আরবের ইহুদীদের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।' মওলানা আকরম খাঁ এর প্রেক্ষিতে বলেন, 'ড. মালিক তাঁর বক্তব্যে আরবের ইহুদীদের প্রসঙ্গ না টানলেই ভালো করতেন। এটা সত্য যে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের ইহুদীদের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; কিন্তু সেটা ছিল ইতিহাসের প্রথম অংশ মাত্র। শেষদিকে তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল এ রকম—আরব থেকে সকল ইহুদীদের বিতাড়িত কর।' মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অতি উচ্চ পদে আসীন একজন ব্যক্তির এহেন মন্তব্যের পরেও আমি আশা করে ছিলাম যে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভা এতটা আন্তরিকতাশূন্য হবে না। কিন্তু দিল্লী চুক্তির শর্ত মেনে নিতে যখন নুরুল আমিন ড. এন বারুরীকে মন্ত্রী মনোনীত করলেন তখন আমার সমস্ত আশা চূর্ণ হয়ে গেল। শর্তে ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তাদের একজন করে প্রতিনিধি পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভায় নিয়োগ পাবে।

## নুরুল আমিন সরকারের আন্তরিকতাশূন্য কার্যকলাপ

পঁচিশ

আমার এক সাধারণ বিবৃতিতে আমি ড. এন বারুরীকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে বলি যে এর ফলে কোনো বিশ্বাস তো ফেরত আসবেই না, বরং নুরুল আমিন সরকারের আন্তরিকতার বিষয়ে যদি সংখ্যালঘুদের মনে কিছু আশার মরীচিকা তখনো জেগে থাকে, তা-ও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার নিজস্ব মত হলো নুরুল আমিনের সরকার যে শুধু আন্তরিকতাহীন কাজ করেছে তা-ই নয়, তাদের ইচ্ছা ছিল দিল্লী চুক্তির প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাধা প্রদান করা। আমি আবারো বলতে চাই যে ড. এন বারুরী নিজেকে ছাড়া আর কারো প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি কংগ্রেসের টিকিটে সংগঠনটির টাকা এবং সাংগঠনিক শক্তির সুবাদে বাংলার আইনসভায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। তিনি নমশূদ্রদের ফেডারেশনটির প্রার্থীদের বিরোধিতা করেছিলেন। নির্বাচিত হবার কিছুদিন পর তিনি

কংগ্রেসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেডারেশনে যোগ দেন। মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবার কালে তিনি ফেডারেশনের সদস্যও ছিলেন না। বাঙ্গালী হিন্দুরা আমার সাথে একমত হবেন যে পূর্ববর্তী কার্যকলাপ, চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দিল্লি চুক্তি অনুসারে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার পক্ষে বারুরী বিবেচনার উপযুক্ত নন।

ছাব্বিশ

আমি জনাব নুরুল আমিনকে এই পদের জন্য তিনজনের নাম সুপারিশ করেছিলাম। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এম এ, এলএলবি, অ্যাডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট। তিনি প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সময়কালে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় ছয় বছর ধরে কলকাতার কয়লাখনি গুদামজাত বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি নমশূদ্র ফেডারেশনের সহসভাপতি ছিলেন। আমার দ্বিতীয় সুপারিশ ছিলেন একজন বিএ, এলএলবি। সংস্কার ঘটার আগে তিনি সাত বছর যাবৎ আইনসভার সদস্য ছিলেন। আমি জানতে ইচ্ছুক ঠিক কোন কারণে জনাব নুরুল আমিন এই দুজন ভদ্রলোককে বাদ দিয়ে এমন একজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। সংগত কারণেই যাঁর নিয়োগের বিরোধিতা আমি করেছিলাম। কোনো প্রতিবাদের মুখোমুখি হবার ভয় ছাড়াই আমি বলতে পারি জনাব নুরুল আমিনের বারুরীকে দিল্লি চুক্তি অনুসারে মন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়াই এরূপ চরম প্রমাণ যে পূর্ব বাংলার সরকার এখানকার হিন্দুদের জান-মাল, সম্মান ও ধর্ম ঠিক রেখে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য সম্পাদিত দিল্লী চুক্তিকে কখনোই গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করেনি।

## সরকারি মদদে হিন্দুদের নির্মূল করার চেষ্টা

সাতাশ

এই প্রসঙ্গে আমি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চাই যে পূর্ব বাংলা সরকার এই প্রদেশ থেকে হিন্দুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে চায় পরিকল্পিতভাবে। এই বিষয়ে আমি আপনাকে একাধিকবার সাক্ষাতে অনেক কথা বলেছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দু নিধনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রক্রিয়া সফলতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে। ডি এন

বারুরী-এর নিয়োগ এবং আমার এই বিষয়ে অসম্মতির পরও পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে তারা কী অর্থে নিজেদের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র দাবি করে। পাকিস্তান না হিন্দুদের বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে, না পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। এখন তারা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মারতে চায় যাতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন তাদের দ্বারা আর প্রভাবিত না হতে পারে।

## যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয় এড়িয়ে চলা

আটাশ

আমি বুঝতে পারি না নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারটিতে কেন এখনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। সংখ্যালঘু সাব-কমিটি তৈরির পর তিন বছর পার হয়ে গেছে। তিনবার মিটিংও হয়ে গিয়েছে। গত ডিসেম্বরে কমিটির সভায় যৌথ বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারে কথা উঠলে পাকিস্তানের সকল স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর জন্য সংরক্ষিত আসন রেখে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর স্বপক্ষে মত দেন। আমরা নমশূদ্রদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রেখে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানাই। গত আগস্টের আরেক সভাতেও এই ব্যাপারে কথা ওঠে। কিন্তু এর উপর কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকদের সময়ক্ষেপণের নীতির পেছনে কোন মতলব কাজ করছে, তা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়।

## হিন্দুদের দুঃসহ ভবিষ্যৎ

উনত্রিশ

এখন আসি দিল্লী চুক্তির ফলে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমি বলতে পারি এখন হিন্দুদের অবস্থা শুধু হতাশাজনক নয় বরং সম্পূর্ণ আশাহীন এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার অমানিশায় আচ্ছন্ন। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ভিতর আস্থা ফিরিয়ে আনতে কিছুই করা হচ্ছে না। চুক্তিটি মুসলিম লীগ কাগজের ভিতরই সীমাবদ্ধ রেখেছে। বিপুলসংখ্যক হিন্দু শরণার্থী, বিশেষ করে নমশূদ্র সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলেও এটা প্রমাণ করে

না যে হিন্দুদের আস্থা ফিরে এসেছে। বরং এটা প্রমাণিত হয় পশ্চিম বাংলা বা ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর তাদের পুনর্বাসনের কোন সুযোগ নেই। উদ্বাস্তু জীবনের বেদনাই তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতে বাধ্য করেছে।

পাশাপাশি অনেকেই ফিরে আসছে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যেতে এবং স্থাবর সম্পত্তির একটা গতি করতে। পূর্ব বাংলায় অতি সাম্প্রতিক কালে কোনো বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেনি, কিন্তু এর কৃতিত্ব দিল্লী চুক্তিকে দিলে তা ভুল হবে। কোনো চুক্তি বা আপস ছাড়াই এটা একসময় বন্ধ হতো, সহজভাবে বলতে গেলে এটা এভাবে চলতে থাকা ছিল অসম্ভব।

ত্রিশ

স্বীকার করতেই হবে দিল্লি চুক্তি সমস্যায় সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এই চুক্তির ভিতর ছিল কিছু শর্ত যাতে ভারত এবং পাকিস্তানের ভিতর বিবদমান সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়। কিন্তু চুক্তির ছয় মাস পরেও কিছুই হয় নাই।

## পূর্ববঙ্গের বর্তমান চিত্র

একত্রিশ

এখন পূর্ব বাংলার অবস্থা কেমন? দেশভাগের পর থেকে প্রায় ৫০ লাখ হিন্দু দেশ ছেড়ে গেছে। গত ফেব্রুয়ারির দাঙ্গা বাদেও এর পেছনে বহু কারণ কাজ করেছে। মুসলিমদের বয়কটের কারণে আইনজ্ঞ, মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, দোকানদার, বিক্রেতা ও বণিকসহ প্রায় সব পেশার হিন্দুদেরই জীবিকার খোঁজে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে হয়েছে। আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ না করেই হিন্দু বসতবাড়ির সম্পূর্ণ মালিকানা কিনে নেয়া এবং বাড়ির মালিকদের কোনোরূপ ভাড়া পরিশোধ না করার ফলে তারা ভারতে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দু জমিদারদের খাজনা দেয়া বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি, হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রতি সব সময়ের হুমকি হিসেবে আছে আনসার, যাদের ব্যাপারে আমি সব জায়গা থেকে অভিযোগ পেয়েছি। শিক্ষা এবং তা প্রদানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে ইসলামীকরণের নামে হস্তক্ষেপ হাইস্কুল এবং কলেজের শিক্ষকদের তাদের পরিচিত পরিবেশের বাইরে ছুড়ে ফেলেছে। তারা এই বাংলা ছেড়ে যাচ্ছে। ফলে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি জানতে পেরেছি, কিছুদিন আগে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

একটি সার্কুলার প্রকাশ করেন, যাতে সব সম্প্রদায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য পবিত্র কোরআন হতে আবৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। আরেকটি সার্কুলারের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বিভিন্ন বাড়ি জিন্নাহ, ইকবাল, লিয়াকত আলী, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ ১২ জন পরিচিত মুসলমানের নাম বলতে বলা হয়। অতি সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, পূর্ব বাংলার ১ হাজার ৫০০ ইংরেজি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৫০০টি চালু আছে। মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা দেশ ছেড়ে যাওয়ায় রোগীদের সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্তির আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। হিন্দু বসতবাড়িতে পূজা-অর্চনা করতেন এমন প্রায় সকল পুরোহিত দেশ ত্যাগ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলো পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে। ফলে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের জন্য বিয়ের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো যেখানে একজন পুরোহিতের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক সেসব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেব-দেবীর মূর্তি প্রস্তুতকারী শিল্পীরাও দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। পুলিশ এবং সার্কেল অফিসারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্মতিতে দমনমূলক নীতির মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডগুলোর সভাপতির পদে হিন্দুদের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে মুসলিমদের দ্বারা। হিন্দু প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সচিবদেরও মুসলিমদের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। হাতে গোনা যে অল্প কজন হিন্দু সরকারি চাকুরিজীবী আছেন, তাদের জীবন দুর্বিষহ। হয় তাদের জুনিয়র মুসলিম সহকর্মীরা তাদের পেছনে ফেলে উপরে উঠে যাচ্ছে অথবা যথেষ্ট বা কোনো কারণ ছাড়াই তাদের অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক একজন হিন্দু পাবলিক প্রসিকিউটরকে কোনো কারণ ছাড়াই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। শ্রীযুক্তা নেলি সেনগুপ্ত-এর এক বিবৃতিতে ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে। অন্তত তাঁকে কেউ মুসলিমবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করতে পারবে না।

## হিন্দুরা রীতিমতো নিরাপত্তাহীন

বত্রিশ

হিন্দুদের সম্পত্তি চুরি-ডাকাতি এবং হত্যাকাণ্ডও আগের মতো চলছে। থানা-পুলিশ হিন্দুদের অভিযোগ নিচ্ছে না। অবশ্য হিন্দু মেয়েদের জোরপূর্বক অপহরণ এবং ধর্ষণের সংখ্যা আগের থেকে কমে গেছে। এর কারণ হলো পূর্ব পাকিস্তানে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সে কোন হিন্দু মেয়ে আর নেই। যারা

পালাতে পারে নাই তারা মুসলিম গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচে নাই। আমি অনেক খবর পেয়েছি নিম্নবর্ণের হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণের খবর। হিন্দুরা বাজারে পাট এবং কৃষিপণ্য বিক্রি করতে যায়। মুসলিম ক্রেতারা খুব কম সময়ই পুরো দাম দেয়। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে আইনের শাসন নেই, বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য।

## পশ্চিম পাকিস্তানে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ

তেত্রিশ

পূর্ব পাকিস্তানকে পাশে সরিয়ে এখন পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে সিন্ধু-এর দিকে মনোনিবেশ করা যাক। দেশভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় লাখ খানেক অস্পৃশ্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিল। এদের মধ্যে একটা বড় অংশকে ইসলামে ধর্মান্তর করা হয়। কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার আবেদনের পরেও অপহৃত ১২ জন নমশূদ্র মেয়ের মাঝে কেবল চারজনকেই এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। অপহৃত মেয়েদের নাম ও তাদের অপহরণকারীদের নাম সরকারের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। এই অপহরণের ঘটনার অফিসার-ইন-চার্জের সাম্প্রতিকতম উত্তর ছিল 'তার কাজ হলো হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করা এবং 'অচ্ছুতেরা' (অস্পৃশ্য/নমশূদ্র) হিন্দু নয়।' যে ক্ষুদ্র হিন্দু জনগোষ্ঠী এখনো সিন্ধু এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে বসবাস করছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমার কাছে করাচি ও সিন্ধ-এর ৩৬৩টি হিন্দু মন্দির ও গুরুদুয়ারার একটি তালিকা আছে (যা কোনো উপায়েই সম্পূর্ণ নয়) যেগুলো এখনো মুসলিমদের দখলে রয়েছে। কিছু কিছু মন্দিরকে মুচির দোকান, কসাইখানা এবং হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। কোনো নোটিশ ব্যতিরেকেই হিন্দুদের কাছ থেকে জমিজমা কেড়ে নিয়ে শরণার্থী ও স্থানীয় মুসলিমদের ভাগ করে দেয়া হয়েছিল, তাদের কেউই আর তা ফেরত পায়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি ২০০ থেকে ৩০০ হিন্দুকে চিনি, যারা বহুকাল পূর্বেই তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক এই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। শত্রু সম্পত্তি নয় হিসেবে ঘোষিত হবার পরেও করাচি পিঞ্জিরাপোল এখনো ট্রাস্টিদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। করাচিতে আমি বহু হতভাগ্য বাবা ও স্বামীর কাছ থেকে আবেদন পেয়েছি অপহৃত হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে, যাদের বেশির ভাগই ছিল নমশূদ্র। এ ব্যাপারে আমি দ্বিতীয় প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতি ছিল শূন্যের কোঠায়। আমি অত্যন্ত দুঃখ পাই এ কথা জেনে যে সিন্ধ-এ এখনো অব্দি বসবাস করা নমশূদ্রদের এক বিরাট অংশকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।

## পাকিস্তান, হিন্দুদের জন্য অভিশাপ

চৌত্রিশ

উপরের সংক্ষিপ্ত চিত্র থেকে এটা বলাই চলে যে সব দিক দিয়েই পাকিস্তানের হিন্দুরা আজ নিজভূমে পরবাসী। তাদের একমাত্র দোষ, তারা হিন্দুধর্মের অনুসারী। মুসলিম লীগের নেতারা বারবার বলছেন পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র আছে এবং থাকবে। ইসলামকে সকল বৈশ্বিক পঙ্কিলতা দূরীকরণের পথ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মতবাদের মধ্যে আপনি ইসলামিক গণতন্ত্রের আনন্দজনক সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে তুলে ধরছেন। শরীয়ত অনুসারে মুসলিমরা একচ্ছত্র শাসক এবং হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তায় বেঁচে থাকা জিম্মির মতো। এর জন্য তাদের আবার দামও দিতে হয়। এবং অন্য সকলের চেয়ে আপনি ভালো করে জানেন প্রধানমন্ত্রী সাহেব এর পরিমাণ কতটুকু। দীর্ঘ বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। এখানে তাদের ভবিষ্যত হলো ধর্মান্তরিত হওয়া অথবা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। উচ্চবংশীয় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই এরই মধ্যে পূর্ব বাংলা ছেড়ে গেছে। যে সকল অভিশপ্ত হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যাবে আমার আশঙ্কা, ধীরে ধীরে পরিকল্পনামাফিক তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হবে নয়তো ধ্বংস করে দেয়া হবে। এটা আসলেই অবাক করার মতো ব্যাপার যে আপনার মতো একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মানবতার প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং সকল সমতা ও শুভবোধের ধ্বংসকারী এরূপ মতবাদে পরিপূর্ণ সম্মত হবার নজির রেখে যাচ্ছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার সাথীদের বলতে চাই, যেরূপ খুশি ব্যবহার করা হোক বা লোভ দেখানো হোক না কেন, হিন্দুরা নিজেদের জন্মভূমিতে নিজেরা জিম্মি হিসেবে গণ্য না হতে পিছপা হবে না। আজকে হয়তো অনেকে দুঃখে—নয় ভয়ে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু

আগামীকাল তারা জীবনের অর্থনীতিতে নিজেদের স্থান আদায় করে নেবার জন্য সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে বলতে পারে ভবিষ্যৎ কী লুকিয়ে রেখেছে? যখন আমি নিশ্চিত যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে আমার অবস্থান হিন্দুদের কোনো উপকারেই আসছে না তখন নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে পরিষ্কার রাখার জন্যই আমি পাকিস্তান এবং বিদেশের হিন্দুদের মনে এমন কোনো মিথ্যে আশার জন্ম দিতে চাই না যে তারা এখানে সম্মান এবং জান-মাল ও সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহকারে বসবাস করতে পারবে। হিন্দুদের নিয়ে বলার ছিল এটুকুই।

## মুসলমানদেরও সামাজিক স্বাধীনতা নেই

পঁয়ত্রিশ

সেই মুসলিমদের কি খবর যারা মুসলিম লীগ এবং তার দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্রকে সমর্থন করেন না? পাকিস্তানে সামাজিক স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ খান আবদুল গাফফার খান নামক সেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমের কথা চিন্তা করুন। কিংবা তাঁর দেশপ্রেমিক ভাই ডা. খান সাহেবের পরিণতি চিন্তা করুন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলার নেতাদের আপনারা বিনা বিচারে আটকে রেখেছেন। বাংলাতে মুসলিম লীগের বিজয় পতাকা বহনকারী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে এখন সরকারের ইচ্ছায় চলতে হয় এবং মুখ খুলতেও অনুমতি লাগে। বাংলার প্রবীণ প্রিয় বৃদ্ধ নেতা, লাহোর প্রস্তাবের রচনাকারী জনাব ফজলুল হক বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের বৈচারিক চার দেয়ালের মাঝে একাকী লাঙ্গল চরাচ্ছেন এবং তথাকথিত ইসলামিক পরিকল্পনা এগিয়ে চলছে নির্মানবিকতার সঙ্গে। আর পূর্ব বাংলার সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করুন, তারা ভালো আছে বলতে পারবে না। তারা আশ্বাস পেয়েছিল স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক স্বাধিকারের। কিন্তু তারা আসলেই কি তা পেয়েছে? যদিও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি মানুষ এখানে থাকে, তবু পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এই অবিচারের পরও করাচির কোন অধিকার নেই সেখান থেকে আদেশ জারি করার। পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী আগ্রহভরে চেয়েছিল রুটি, কিন্তু মরু সিন্ধু এবং পাঞ্জাব থেকে সাহায্যের বদলে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ও শরিয়া আইনের রহস্যময় পথে সেটা পাথর হয়ে এসেছে।

## আমার নিজের দুঃখভারাক্রান্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা

ছত্রিশ

পাকিস্তানের সমগ্র চিত্র আর অন্যের প্রতি অবিচার আর শোষণের কথা বাদ দিলেও আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আপনি প্রধানমন্ত্রী এবং শাসক দলের প্রধান হিসেবে আপনার নিজের অবস্থান ব্যবহার করে আমাকে একটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলেছিলেন এবং আমি গত ৮ সেপ্টেম্বর তা করেছিও। আপনি জানতেন আমি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অর্ধসত্যের সংমিশ্রণে কোন বক্তব্য দিতে রাজি নই। কিন্তু আমি একজন মন্ত্রী এবং আপনার অধীনে কাজ করছি। তাই আমার পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এই মিথ্যার ভার আর বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করব। এই পদত্যাগপত্র আমি এখনই আপনার হাতে জমা দিচ্ছি এবং আমি আশা করছি আপনি বিন্দুমাত্র দেরি না করে তা গ্রহণ করবেন। অবশ্যই আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এই পদত্যাগপত্র নিয়ে কী করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। অথবা আপনার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রীতিনীতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে মিলে এমন কোন উপায়ে লুকিয়ে ফেলার।

আপনার বাধ্যগত
এসডি./-জে এন মণ্ডল
৮ অক্টোবর ১৯৫০

## তথ্যসূত্র

১. এই লেখায় কাদের কেন 'দলিত' বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ১৬ নং তথ্যসূত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে।

২. ড. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭*, ৩১ আগস্ট, ২০০৯, বাঙ্গালনামা, পৃ. ১। https://bangalnama.wordpress.com/2009/08/31/unnayan-bivajan-jati-namasudra-andolon/

৩. দেখুন, যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগপত্র, *সংযুক্তি: দুই*।

৪. ১৮৭২-এর শুমারিতে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান ছিল। ১৮৮১ সালের শুমারিতে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়।

৫. সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, ১৮৫৭-১৯৪৭, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, ৮৬।

৬. বিস্তারিত দেখুন, জয়া চ্যাটার্জি, *বাংলা ভাগ হলো*, অনুবাদ: আবু জাফর, ইউপিএল, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৩৮।

৭. নমশূদ্ররা ছিল প্রধানত বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনাকেন্দ্রিক। আর রাজবংশীরা ছিল রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িকেন্দ্রিক। এই আলোচনা রাজবংশীদের তৎকালীন রাজনৈতিক উত্থান-পতন-দেশান্তর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। সেটা পৃথকভাবে করার ইচ্ছা রইল। নিঃসন্দেহে বর্তমান আলোচনার একটা বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে থাকছে এটা। তবে আপাতত এটুকু বলে রাখা দরকার যে, বাংলায় দলিত রাজনৈতিক সংগ্রামের শুরুতে একদিকে যেমন নমশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদায়ী সক্রিয়তা ছিল, তেমনি এরূপ সংগ্রামের দ্বিতীয় একটি ভরকেন্দ্র ছিল উত্তর বাংলার রাজবংশী-অধ্যুষিত রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং 'দেশীয় রাজ্য' কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা। ১৯১১-এর শুমারিতে নমশূদ্রদের সংখ্যা যেখানে দেখা যায় ২০ লাখ ৮৭ হাজার, রাজবংশীরা সেখানে ছিল ২০ লাখ ৪৯ হাজার। নমশূদ্রদের মতোই রাজবংশীদেরও সমাবেশশক্তি ধ্বংস করেছিল ১৯৪৭-এর 'ভারত ভাগ', যাকে

বলা যায় বাংলার দলিত রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে 'দেশভাগ'-এর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। নমশূদ্রদের সমাবেশশক্তি ধ্বংস হয় বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী হওয়ায় আর রাজবংশীদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল কিছুটা ভিন্ন আদলে—তাদের বসতি এলাকাগুলোর মাঝ দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

নমশূদ্র, রাজবংশীসহ বাংলার দলিতদের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের সমাবেশ শক্তির রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ বিশেষভাবে দৃশ্যগোচর হয়ে ওঠে যেসব জন-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার একটি ছিল 'তেভাগা আন্দোলন'।

৮. কারণ, ১৯৩২ এবং ১৯৩৪ সালের মধ্যে কৃষিজীবী সমাজের প্রধান ফসল পাট ও ধানের মূল্য ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকের মূল্যের চেয়ে ৬০ শতাংশের বেশি কমে যায় এবং যা অন্তত ৪-৫ বছর স্থায়ী হয়।

৯. ১৯১১ সালের শুমারিতে দেখা যায়, বাকেরগঞ্জে খ্রিষ্টান সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ হাজার ৩৪১; ১৯২১-এর শুমারিতে ফরিদপুরে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা পাওয়া যায় ৬ হাজার ২৯৯ জন। উপরিউক্ত তথ্য তুলে ধরে গবেষক মাশাউকি উত্তনা লিখেছেন, 'The conversion is related to the rebellious spirit 'against caste bondage an zamindari oppression'. *Caste System, Untouchability and the Depressed*, Edited: H. Kotani, Monohar, New Delhi, 1997, P. 229.

১০. জয়া চ্যাটার্জি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

১১. Caste System, Untouchability and the Depressed, *Ibid*, p. 231-2. এরূপ প্রত্যাখ্যানের বিনিময়ে দলিত-নমশূদ্ররা সরকার থেকে শিক্ষা ও চাকরিতে সুবিধা আদায়ের কৌশল হিসেবে নিয়েছিল এবং তাতে সফল ছিল। শিক্ষার সুযোগের প্রসারই পরবর্তীকালে তাদের রাজনীতিতে অধিক হারে অভিষেক ত্বরান্বিত করে।

১২. স্বদেশি নেতাদের কেউ কেউ দলিত-নমশূদ্র-মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান কমাতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারকে এরূপ ধারার প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রথমজন ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয়জন ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে ভূমিকার জন্য আজও স্থানীয়ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরিত হন।

১৩. বাংলাকেন্দ্রিক দেশভাগ সাহিত্যে সম্প্রতি নারী, নিম্নবর্গ এবং অঞ্চলগত যেসব বিবরণ লিখিত হচ্ছে, সেখানেও তা তুলে ধরা হচ্ছে দেশভাগ-পরবর্তী দুর্দশার শিকার জনগোষ্ঠীর বিবরণের অংশ হিসেবে। দলিত এবং নারী সেখানে ঘটনার পরিচালক বা পক্ষরূপে উপস্থিত আছে সামান্যই।

১৪. ১৮৭৩-এর এই আন্দোলনে নমশূদ্রদের ডাকে মুসলমানরা ব্যাপকভিত্তিক সাড়া দিয়েছিলেন (*Outlook*, India, 29 August, 2016)। লক্ষণীয়, শান্তিপূর্ণ ও অহিংস 'বয়কট'ধর্মী এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজি অভিধানে 'boycott' শব্দটি যুক্ত হওয়ার (১৮৮০) তিন বছর আগেই এবং ভারতবর্ষে 'অহিংস রাজনীতি' বলতেই ভদ্রলোক গবেষকদের সঙ্গতভাবে যাঁর কথা মনে পড়ে সেই মোহনদাস গান্ধীর বয়স তখন মাত্র তিন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আগ্রহোদ্দীপক আলোচনা দেখুন, A K Biswas, *How the Bengali chotolok shaped India's destiny*, Forward Press, India, 20th Nov, 2016.

১৮৮১ সালের জনগণনার পর সিলেটের নমশূদ্রদের দেওয়া পিটিশনের ভিত্তিতে জেলার সহকারী কমিশনার ম্যাকফারসন নিম্নোক্ত আদেশ দেন :

NOTICE TO GO TO ALL STAMP VENDORS
NOTICE TO BE HUNG UP

In Tahsil, In Court Office, In English Office, In Nazarat, In criminal Office, In Municipal out post.
That Namasudra must always be written and not change or Chandal for all person of the said caste that Deputy Commissioner has ordeed that any one who does not write Namasudra shall be removed from employ.

Sylhet
Date: 09.09.1883

Sd./-W.C.Macpherson
Assistant Commissioner

যশোরে এরূপ নির্দেশনার হদিশ মেলে ১৮৮০ সালে। দেখুন : মনোশান্ত বিশ্বাস, *বাংলার মতুয়া আন্দোলন*, সেতু, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২৯।

১৫. এ সময় ফরিদপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন W. S. Wells। এই আন্দোলন দ্রুতই বাকেরগঞ্জ ও যশোরে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় সাড়ে সাত লাখ নমশূদ্র শামিল ছিল এতে এবং প্রায় ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল এই আন্দোলন। যদিও শেষ বিচারে এই আন্দোলন পূর্ণ সফল হয়নি, কিন্তু আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নমশূদ্র সমাজে চেতনার বিরাট উন্মেষ ঘটায়।

১৬. এখানে 'তফসিলি' বলতে বোঝানো হচ্ছে যেসব নিপীড়িত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে ('অবর্ণ')—যাদের ১৯৩৫-এর ইন্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট অ্যাক্টে 'শিডিউল কাস্টস' এবং ১৯৫০ সালের সংবিধানে 'তফসিলি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পূর্বে এঁরা বিভিন্ন সময় 'ডিপ্রেসড', 'ব্যাকওয়ার্ড', 'অনুন্নত' ইত্যাদি নামে অভিহিত হতেন। ১৯১১ সালে প্রথম ঔপনিবেশিক শক্তি এদের

('Depressed classes') একটি নতুন 'আইনি সত্তা' বা 'লিগ্যাল ক্যাটাগরি' হিসেবে শনাক্ত করে এবং তাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে থাকে প্রশাসনিক নানান কাজে। এই 'ক্যাটাগরি'তে জাতিগত 'অচ্ছুত' ছাড়াও ট্রাইবালদেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটে তখন। পরে ১৯৩৬-এ অনেকটা এদেরই 'শিডিউল কাস্টস' ('Scheduled Castes') হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরূপ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল প্রাথমিকভাবে ৭৮টি। এসব সম্প্রদায়ের অধিকাংশই উচ্চবর্ণীয়ের তরফ থেকে অস্পৃশ্যতাজনিত বিবিধ বঞ্চনার শিকার হতো এবং আজও স্বল্পমাত্রায় হয়ে থাকে। সে কারণে এই লেখায় তাদের 'দলিত' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। 'দলিত' কোনো বিশেষ জাতি নয়—বরং একটা উপলব্ধি। নিম্নবর্ণের মানুষ তার জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বহুকাল ধরে আনন্দ-বেদনা-নিপীড়নের যে একক অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে, সেটাই তাকে বৃহত্তর 'দলিত' (নিষ্পেষিত ও দলনের শিকার) সত্তার অন্তর্ভুক্ত করে। সকল তফসিলি সম্প্রদায় দলিত নয়; তবে অধিকাংশই দলিত। অন্তত এ লেখায় যে সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে তখন অধিকাংশই দলিত ছিল। গান্ধী এরূপ 'দলিত'দের 'হরিজন' (ঈশ্বরের পুত্র) হিসেবে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো দলিতরা আজও ঈশ্বরের পুত্র হয়ে ওঠেনি। তাদের দ-লি-ত ম-থি-ত অবস্থা বদলায়নি।

১৭. মনোশান্ত বিশ্বাস, *বাংলার মতুয়া আন্দোলন*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.২২৫। তবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর ঢাকার নবাবদের সঙ্গে পারস্পরিক অভিন্ন স্বার্থ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন বলে সাক্ষ্য মেলে।

১৮. এই উভয় ধারাই ১৯৩৫-এর 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর 'শিডিউল অব কাস্টস'-এর বদৌলতে পরবর্তীকালে 'শিডিউল কাস্টস' শিরোনাম পায়, যা ছিল কার্যত সামাজিকভাবে 'দলিত'দের দাপ্তরিক পরিচয় মাত্র।

১৯. পুরো নাম পেরিয়ার ই বি রামস্বামী। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী সর্বজন শ্রদ্ধেয় অ্যাকটিভিস্ট। একই সঙ্গে দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদী। ১৮৭৯-এ মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে জন্ম। ধর্মীয় জাতপাত প্রশ্নে কৈশোর থেকেই সোচ্চার। প্রথমে 'জাস্টিস পার্টি' গঠন করেন, পরে যার নাম হয় *দ্রাবিড় কাজগাম*। এই দল পরে ভাগ হয় এবং পেরিয়ার তাঁর অনুসারীদের নিয়ে 'আত্মসম্মান আন্দোলন' নামে একরূপ সামাজিক সংগ্রাম শুরু করেন দক্ষিণ ভারতে। এই সংগ্রামের প্রধান এক দাবি ছিল বর্ণভিত্তিক বঞ্চনার অবসান। তাঁর নেতৃত্বে অনেকবার অচ্ছুতদের 'মন্দিরে-প্রবেশ আন্দোলন' হয়। ১৯৭৩ সালে পেরিয়ার মারা যান।

২০ কার্তিক ঠাকুর, *তফসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ইতিহাস*, র‍্যামন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭।

কার্তিক ঠাকুর এ-ও লিখেছেন, 'অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ১৮টি সংগঠন সাইমন কমিশনের নিকট তাদের সুপারিশ পেশ করেছিল—এর মধ্যে ১৭টি সংগঠনই দাবি করেছিল—পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি।' পৃ. ৩৮।

এই তথ্য প্রমাণ করে, ভারতে তত দিনে কেবল মুসলমানরাই নয়, দলিত সম্প্রদায়ও তৃতীয় একটি পৃথক রাজনৈতিক বর্গ আকারে হাজির হয়েছিল। ফলে *মুসলমানরা পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবি তুলে ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল ও বিভক্ত করছিল*—এরূপ অভিমত সত্য নয়, বরং মুসলমানদের মতোই দলিতদেরও নিজেদের পৃথক দাবিনামা ছিল। উক্তরূপ পৃথক দাবিনামার বাস্তব সামাজিক ভিত্তিও ছিল।

সাউথবারো কমিশনের সুপারিশের আলোকেই ঘোষিত হয়েছিল ১৯১৯-এর 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'। যার ফলে ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং বাংলার প্রাদেশিক সভায় দলিতদের একজন করে সদস্য মনোনীত হয়। এটা ছিল নীতিনির্ধারক পরিমণ্ডলে দলিত প্রতিনিধিত্বের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। কংগ্রেস হিন্দু পরিমণ্ডলের বাইরে দলিতদের পৃথক নির্বাচনী আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করছিল। স্যার জন সাইমনের ভারতে আগমনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 'গো ব্যাক সাইমন' আন্দোলনের পেছনে এটাও একটা কারণ ছিল তখন।

২১. উল্লেখ্য, এম সি রাজা ছিলেন আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডলের মতোই সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় তফসিলি সংগঠক। জাতিতে তামিল এম সি রাজা ১৯২৬ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। তাঁকে ওই আইনসভায় প্রথম ভারতীয় তফসিলি সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী সে সময় তফসিলিদের বিশেষ শক্তি জুগিয়েছিল। মূলত লর্ড সাউথবারো কমিশনের কাছে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবিতে দলিতদের ব্যাপক আবেদনের মধ্য দিয়েই কেন্দ্রীয় আইনসভায় দলিত প্রতিনিধিত্বের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে 'তফসিলি'রা 'আদি-দ্রাবিড়' নামে অভিহিত হতে আগ্রহী। রাজাকে সেই অর্থে আদি-দ্রাবিড়দের প্রতিনিধিও অভিহিত করা যায়। আম্বেদকর, পেরিয়ার, যোগেন মণ্ডল ও এম সি রাজাকে ১৯৪৭ কেন্দ্রিক ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের চার প্রধান নিম্নবর্গীয় চরিত্র বলা যায়। যাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে অবদমিত জাতিসত্তাগুলোর নেতা, নিজ নিজ জনপদের নেতা, আবার জাতীয় রাজনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের 'স্বাধীনতার সংগ্রামের মূলধারার ইতিহাসে' তাঁদের উক্তরূপ বহুমাত্রিক উপস্থিতি শনাক্ত হতে দেখা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ইতিহাসে দলিত নেতা হিসেবে

জগজীবন রাম (বিহার)-এর বিশেষ স্বীকৃতি দেখা যায়। সম্ভবত তিনি দীর্ঘ সময় কংগ্রেসভুক্ত থাকার কারণেই ইতিহাস তাঁর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখিয়েছে।

২২. 'মতুয়া'রা বাংলার প্রধানতম তফসিলি নমশূদ্রদেরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক অংশীদার। মতুয়া জ্ঞানতত্ত্বের বিশেষ বিকাশ ঘটান গুরুচাঁদ। অতি সংক্ষেপে বললে, এই জ্ঞানতত্ত্ব বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখান করে এবং ধর্মচর্চা থেকে সাম্প্রদায়িকতা লোপাটের ডাক দেয়। যার সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে যে 'দ্বাদশ আজ্ঞা' রয়েছে, তাতে দেখা যায়, জাতিভেদকে সর্বপ্রকার ভেদাভেদের কারণ হিসেবে শনাক্ত করা হচ্ছে। বর্ণভেদহীন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে সম্প্রীতির কথা বলে 'দ্বাদশ আজ্ঞা'র পঞ্চম ও সপ্তম আজ্ঞা। বলা হয়েছে, 'কিবা শূদ্র, কিবা ন্যাসী, কিবা যোগী হয়— যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়।'

এই জ্ঞানতত্ত্ব একই সঙ্গে 'সংসারপ্রেমী' এবং তা পুরোহিততন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। মানুষকে অপার্থিবতার সাধনা থেকে বাস্তব জগতের বোঝাপড়ার ওপর দাঁড় করাতে তৎপর ছিলেন মতুয়া সাধকেরা। তাঁদের মতে, বাস্তব জগতের বাঁচা-মরার লড়াইটাই মূলত ধর্মের লড়াই। এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, মতুয়া ধর্মের তাত্ত্বিক আদর্শবাদ ও ধর্মীয় রীতিনীতি, মনোশান্ত বিশ্বাস, *বাংলার মতুয়া আন্দোলন*, সেতু, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৯-৭৫।

২৩. এ বছরই যোগেন্দ্রনাথ বিয়ে করেন গৌরনদী থানার খাগবাড়ি গ্রামের কমলা নামীয় স্থানীয় বারুই সম্প্রদায়ের এক নারীকে। বারুইরা মূলত পান আবাদি সম্প্রদায় এবং আর্থিকভাবে তুলনামূলকভাবে যোগেনের পরিবার থেকে সচ্ছল। যোগেন পরবর্তী শিক্ষাজীবনে তাঁর স্ত্রীর পিতার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন রামদয়াল মণ্ডল ও সন্ধ্যাদেবী।

২৪. *Bengal district Gazetteers*, B Volume, Backergunge: Statistics 1900-1901 to 1910-1911, Calcutta, 1914. p. 5, 7.

২৫. জয়া চ্যাটার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৮।

২৬. সমসাময়িক ওই 'নতুন রাজনীতি'র চরিত্রও ছিল অনেকাংশেই অসাম্প্রদায়িক। এর বড় এক প্রমাণ দেখা যায়, মুসলমান প্রধান একটি আসনে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রজা পার্টির বিজয়। ওই নির্বাচনের মূল আকর্ষণ ছিল এই লড়াই। যেখানে নাজিমুদ্দিনের 'মুসলমান পরিচয়ের রাজনীতি'র বিপরীতে ফজলুল হকের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল 'জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল।' ১৩ হাজার ৭৪২ জন ভোটার যখন দ্বিতীয়

৩০. এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস সাতজন তফসিলিসহ ৫৪টি আসন পায়। কংগ্রেস কোনো মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ফলে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আসনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ পায় ৩৯টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি পায় ৪০টি। ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও নির্দল তফসিলিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বিধানসভার অভ্যন্তরে ২০ জন তফসিলি সদস্য মিলে 'ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট পার্টি' গঠন করেন। যার সভাপতি হন হেমচন্দ্র নস্কর ও সাধারণ সম্পাদক হন যোগেন মণ্ডল। বাংলায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সমাজতাত্ত্বিক যে দিকটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, তখনো মুসলমানদের ভোট মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীভূত ছিল না। যদিও তখনি হিন্দু ভোট অনেকাংশে কংগ্রেসে কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্তত '১৯৪০ পর্যন্ত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক চিন্তায় মুসলমান জনগণ তখনো ঐক্যবদ্ধ হননি।' মোহাম্মদ তোয়াহা, *স্মৃতিকথা*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৩২। বস্তুত ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির উত্থান প্রমাণ করে বাংলায় মুসলমান নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, 'বহুজন'বাদী রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে ঘটেছিল।

৩১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, *মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৭।

৩২. বর্ণবৈরিতার এই চিত্র ১৯৪৬-এর নির্বাচনে এসে গ্রামীণ বাকেরগঞ্জে বারুই (পানচাষি) প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে তীব্র সহিংসতার জন্ম দিয়েছিল। তার কিছু বিবরণের জন্য দেখুন, *Caste System, Untouchability and the Depressed*, Edited: H. Kotani, Monohar, New Delhi, 1997, P. 258-260.

এই সহিংসতার অভিজ্ঞতার একটি বড় দিক হিসেবে দেখা যায়, যদিও যোগেন মণ্ডল নির্বাচনপূর্ববর্তী সময়ে এবং পরেও প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু স্থানীয় পুলিশ বর্ণহিন্দুদের পক্ষ নিয়েই তাঁর নিম্নবর্গীয় সমর্থকদের ওপর চড়াও হচ্ছিল। এই সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আইন ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ১৯৪৬-এ যোগেনের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যাঘাত ঘটেছিল। ফলে পুরোনো নির্বাচনী আসনটিতে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তিনি পার্শ্ববর্তী সংরক্ষিত আসনে বিজয়ী হন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যোগেন মণ্ডলের পূর্বে ১৯২১ সালের নির্বাচনে তফসিলি প্রার্থী হিসেবে জিতেছিলেন (বরিশাল দক্ষিণ) নিরোধ বিহারী মল্লিক।

৩৩. *Caste System, Untouchability and the Depressed*, Edited: H. Kotani, Monohar, 1997, P. 242-243

৩৪. *The Amrita Bazar Patrika*, Jan. 28, 1937.

৩৫. এই বিষয়ে অবশ্য গবেষক Masayuki Usuda দাবি করেছেন, সাধারণ আসনে বিজয়ী তফসিলি প্রার্থী ছিলেন দুজন। *Ibid*, p. 243.

৩৬. *Ibid*, p. 243. উক্তরূপ মৈত্রী ও সংহতি যে কেবল নির্বাচনকেন্দ্রিক ছিল না তার সাক্ষ্য হিসেবে দেখা যায়, এই হাসেম আলী খানকে নিয়েই যোগেন মণ্ডল নির্বাচন-পরবর্তীকালে আগৈলঝাড়া এলাকায় বেগাই হালদার পাবলিক একাডেমির জন্য তহবিল সংগ্রহ করছিলেন।

৩৭. ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭—এই এক দশক যেমন যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্ব, তেমনি ঔপনিবেশিক বাংলায় নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রেরও সূচনাপর্ব। আলোচ্য সময়ে বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হয়। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩), নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-৪৭)। প্রথম মন্ত্রিসভায় তফসিলি প্রতিনিধি ছিলেন মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, তৃতীয় মন্ত্রিসভায় প্রেমহরি বর্মণ, পুলিন বিহারী মল্লিক এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। লক্ষণীয় যে দেশভাগ-পূর্ববর্তী দশকটিতে বাংলায় ক্ষমতার পরিসরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বর্ণহিন্দুরা অপেক্ষাকৃত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। একবারও সরকার গঠন করতে পারেনি তারা। অন্যদিকে তফসিলিদের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের যৌথতা গড়ে উঠছিল। বস্তুত পরবর্তীকালে বাংলা ভাগের রাজনৈতিক কারণটি নিহিত রয়েছে পূর্ববর্তী এক দশকের রাজনীতির ওই চিত্রের মাঝে।

৩৮. *জাগরণ* ছিল দলিত-নমশূদ্রদের লেখনী-সক্রিয়তার উল্লেখযোগ্য পঞ্চম উদ্যোগ। নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে এর পূর্বে দলিত-নমশূদ্রদের ওই রূপ আরও অন্তত চারটি পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো *নমশূদ্র হিতৈষী*, *নমশূদ্র সখা*, *নমশূদ্র সুহৃদ* এবং *পতাকা*। এই চারটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ভারতচন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত দাস, বিপিন গোপালচন্দ্র দত্ত এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। গত শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন দশকে এই পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতো। *জাগরণ* নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৪৩-এর জুন থেকে। ১৯৫০ সালে যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান ত্যাগ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ এর কার্যালয় এবং তফসিলি ফেডারেশনের কার্যালয় ছিল ঢাকার পাটুয়াটুলীতে। বাংলায় নমশূদ্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার অসামান্য অবদান ছিল। সর্বশেষ এর মুদ্রণসংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। সেকালের বিবেচনায় এরূপ মুদ্রণসংখ্যা বেশ বড় ছিল। এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার যোগেন মণ্ডল নির্বাহ করলেও সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে অনেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। যার মধ্যে

আছেন বিনয় কৃষ্ণ সরকার, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অপূর্ব লাল মজুমদার, শশীভূষণ হালদার প্রমুখ।

৩৯. অন্য দফাগুলোর বিস্তারিতের জন্য দেখুন, *মহাপ্রাণ যোগেন মণ্ডল*, সম্পাদনা: জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১৪৮-৪৯।

৪০. যোগেন মণ্ডলের ঐতিহাসিক ওই ভাষণটি দেখুন *প্রথম সংযুক্তিতে*।

৪১. বোম্বে কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন এই সময় বালা সাহেব গঙ্গাধর খের। মূলত বল্লভভাই প্যাটেল বালা সাহেব গঙ্গাধরকে এটা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে আম্বেদকর যেন নির্বাচনে পরাজিত হন। ফলে কংগ্রেস সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেয় আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারানোর। পরে আবার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে তারা আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে ১৯৪৭-এর জুলাইয়ে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিশেষ হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকা নিয়েছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজেন্দ্র প্রসাদ এই হস্তক্ষেপের কারণ হিসেবে বলেছিলেন, 'সংবিধান সভার বিভিন্ন কমিটিতে আম্বেদকর এমন অবদান রাখছিলেন যে তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ ছিল না' (দেখুন http://www.mainstreamweekly.net/article 6905.html)। এবারও আম্বেদকরকে জিতিয়ে আনতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন গঙ্গাধর। তবে সংবিধান প্রণয়ন শেষে আম্বেদকরকে আবার কংগ্রেস ত্যাগ করে। তারই ফল হিসেবে ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে (১৯৫১-৫২) বোম্বে উত্তর আসন থেকে আম্বেদকর কেবল পরাজিতই হননি, ভোটে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করতে দেখা যায় তাঁকে। পরের লোকসভা নির্বাচনেও তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাস্ত হন।

৪২. এ ক্ষেত্রে যোগেন মণ্ডলের পাশাপাশি আরেক নমশূদ্র নেতা খুলনার মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। মূলত তাঁর পরিবর্তেই আম্বেদকরকে প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই করা হয়।

৪৩. পরবর্তীকালে আম্বেদকরের নির্বাচনী এলাকা পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় কংগ্রেস তাঁকে বোম্বে থেকে পুনর্নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করেছিল। বোম্বের এই আসনের তখনকার জনপ্রতিনিধি ছিলেন মুকুন্দ রামরাও জয়াকর (১৮৭৩-১৯৫৯)। কিন্তু তাঁকে পাল্টে আম্বেদকরকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪৪. এ বিষয়ে আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেখুন:
http://velivada.com/2017/06/01/why-go-for-conversion-speech-by-dr-b-r-ambedkar/ এবং যোগেন মণ্ডলের অভিমত দেখুন: *গোপালগঞ্জ ভাষণ*, সংযুক্তি এক।

৪৫. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এ বিষয়ে ১৯৩২ সালের আগস্টে 'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বণ্টন'-এর এক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

(Communal Award) প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। যাতে হিন্দুদের মাঝে অনুন্নত শ্রেণি হিসেবে দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব পেশের কিছুদিন পরই ২০ সেপ্টেম্বর গান্ধী অনশন শুরু করেন। সম্প্রদায়গত এই রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলার আইনসভায় আসন নির্ধারিত হয় ২৫০টি। অনুন্নত শ্রেণিসহ হিন্দুদের জন্য ৮০টি আসন (মোট আসনের ৩২ শতাংশ), মুসলমানদের জন্য ১১৯টি আসন (মোট আসনের ৪৮ শতাংশ), ইউরোপীয়দের জন্য ২৫টি আসন (মোট আসনের ১০ ভাগ) এবং বাকিটা অন্যদের জন্য রাখা হয়। বিধান হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। প্রতিনিধিত্বের আসনের পরিসর নির্ধারিত হবে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটারের ভিত্তিতে।

এই রোয়েদাদ বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃত্বকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী-বন্ধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, এই রোয়েদাদের মধ্য দিয়ে বাংলার আইনসভায় প্রথমবারের মতো হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠার অবকাশ তৈরি হয়। শুরুতে আসন বণ্টনের এই সাম্প্রদায়িকতায় মুসলমানরা হকচকিত চিত্তেই দেখছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষোভের কারণে মুসলমানরা ভাবতে শুরু করে, রোয়েদাদ তাদের জন্য সম্ভবত ভালো হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ৮০টিতে আবার তফসিলিদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত ছিল (যে আসনগুলোতে অস্পৃশ্যরাই নিজেদের প্রতিনিধি বাছাই করবে, তবে অন্য আসনেও তাদের ভোটের অধিকার থাকবে)। ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য বাকি থাকল প্রাদেশিক সভায় পুরো আসনের ২৮ শতাংশ মাত্র। পরে 'পুনা চুক্তি'তে তফসিলি আসন সংরক্ষণ ৩০-এ উন্নীত হয়। এর মধ্য দিয়ে বর্ণহিন্দুদের আসন-পরিসর আরও কমে যায় এবং তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে। তফসিলিরা এ সময় হিন্দু আসনে সংরক্ষণ নয়, বরং চাইছিল মুসলমানদের মতো পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী হতে, যা 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ'-এ প্রথম অবস্থায় স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু গান্ধী 'জীবন দিয়ে' তা প্রতিরোধের কথা জানালে পুনা চুক্তির মধ্য দিয়ে রোয়েদাদের ধরন পাল্টে যায়। পুনা চুক্তি হিন্দু আসনের মধ্যেই তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে যৌথ ভোটের ব্যবস্থা করা হয় (জয়া চ্যাটার্জি, *বাংলা ভাগ হলো*, অনুবাদ: আবু জাফর, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৭।) অর্থাৎ পুনা চুক্তি তফসিলিদের আসন বাড়ালেও *পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী* হিসেবে তার অবস্থান বাদ পড়ে তাতে। আলোচ্য সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ জেলা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রযোজ্য ছিল না। সেখানে আসন সংরক্ষণ ছাড়াই যৌথ নির্বাচন বহাল ছিল।

৪৬. বিস্তারিত দেখুন, *Caste System, Untouchability and the Depressed*, Ibid. p. 250-251.

৪৭. কার্তিক ঠাকুর, *তফসিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ইতিহাস*, র‍্যামন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬১। এ বিষয়ে আম্বেদকর তাঁর রচনা *Pakistan or the partition of India* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

৪৮. Sekhar Bandyopadhyay and Ansua Basu ray Chaudhury, *Partition in Bengal, Re-visiting the Caste Question, 1946-47*, Sage, 2017, p.238.

৪৯. এরূপ ভীতি ছড়ানোর মূলে কাজ করেছিল বর্ণহিন্দু নেতৃত্বের এই বোধ যে, অখণ্ড বাংলায় বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় তারা হয়তো কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারবে না। ১৯৪৭-এর আগস্ট-পূর্ববর্তী চারটি সরকারের অভিজ্ঞতা এই বোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে থাকবে।

৫০. Haimanti Roy, *A Partition of Contigency*, Cambridge, p.21, https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/51358#files-area]

৫১. Dwaipayan Sen, *No matter how Jogendranath had to be defeated: The Scheduled Castes Federation and the making of Partition in Bengal, 1945-1947*, First Published August 28, 2012, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0019464612455273, c,,. 343.

৫২. ইংরেজি ভাষার কাগজ হিসেবে *অমৃতবাজার*-এর ওই সময়কার নীতিনির্ধারক এলিটদের কাছে বিশেষ আবেদন ছিল। এই দৈনিক কীভাবে বাংলা ভাগ প্রশ্নে জনমতকে প্রভাবিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের ১৯৪৭-এর ২৩ এপ্রিলে প্রকাশিত একটি জনমত জরিপের উল্লেখ করা যায়। ওই জরিপে একটা প্রশ্ন রাখা হয়, 'আপনি কি বাংলার হিন্দুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র সমর্থন করেন?' দেখা যায়, এতে ৯৮.৩ শতাংশ উত্তরদাতা হিন্দুদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সমর্থন করেছেন। *অমৃতবাজার* তখন উপসংহার টানে যে, বাংলা ভাগ যৌক্তিক। বাংলার বাসিন্দারা ভাগই চাইছে। কিন্তু শুমারিসম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যে পরে দেখা যায় যে, এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যত মানুষের কাছে, তাদের ৯৯.৬ শতাংশ ছিল হিন্দু। দশমিক ৪ শতাংশ ছিল মাত্র মুসলমান। [Haimanti roy, A Partition of Contigency; https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/51358#files-area]

*অমৃতবাজার*-এর মতোই তখন *আনন্দবাজার পত্রিকা*ও একইভাবে বাংলা ভাগকে ন্যায্যতা দিতে খুব পরিকল্পিতভাবে মতামত গঠন করছিল। এই দুটি প্রভাবশালী দৈনিকের উক্তরূপ বৈরী ভূমিকার কারণে বাংলা ভাগ বিরোধী

রাজনৈতিক শক্তিসমূহের পক্ষে মতামত গঠন দুরূহ হয়ে পড়েছিল। উপরিউক্ত দুটি পত্রিকা বাংলা ভাগকে সমর্থন করতে হিন্দুদের মাঝে ভীতিও ছড়াচ্ছিল। তাদের প্রচারণার মর্মবস্তু ছিল এই যে, বাংলা অখণ্ড থাকলে চিরতরে মুসলমান আধিপত্য মেনে নিতে হবে এবং তাতে হিন্দু সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যাবে; এমনও হতে পারে অখণ্ড বাংলা পরে পাকিস্তানে যোগ দিচ্ছে। এরূপ ভীতির প্রসার বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

৫৩. Dwaipayan Sen, No matter how Jogendranath had to be defeated', *Ibid*, p. 356.

৫৪. Sekhar Bandyopadhyay and Ansua Basu Ray Chaudhury, *Partition in Bengal, Re-visiting the Caste Question, 1946-47*, Sage, 2017, p.253.

৫৫. N. Mansergh and EWR Lumby, *The Transfer of Power 1942-47*, no.23, Her Majesty's Stationary Office, London, p. 39-42

৫৬. Dwaipayan Sen, *No matter how Jogendranath had to be defeated'*, *Ibid*, p. 351.

৫৭. *পাকিস্তান গণপরিষদে জিন্নাহর প্রথম ভাষণ*, ১১ আগস্ট ১৯৪৭।

৫৮. Dwaipayan Sen, *No matter how Jogendranath had to be defeated'*, *Ibid*, p. 345.

৫৯. দেবেশ রায়, '১৬ আগস্টের জুয়ো, কে কার পার্টনার?', *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০৩০।

৬০. ১৯৪৬ সালের ১৯ জুলাই মুম্বাইয়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে লীগ তাদের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে ১৬ আগস্ট ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। লীগ কর্মসূচিটি পালনের পরিকল্পনা করে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পুনঃপুন এরূপ গণবিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্রিটিশরা কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরই ভারত ত্যাগ করবে। ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল, যিনি মুসলিম লীগের সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু প্যাটেলের দাবির ব্যাপারে নীরব ছিলেন। ইতিমধ্যে ভাইসরয় নেহরুকে দিল্লিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে আহবান জানান। এতে জিন্নাহ ক্ষুব্ধ হন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের লক্ষ্যেই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর ডাক দেন। কিন্তু ওই দিনই কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে কমপক্ষে ৫ হাজার জন নিহত হয় এবং আহত হয় আরও ১৫ হাজার। এই দাঙ্গা ১৬ আগস্ট শুরু হয়ে ২০ আগস্ট পর্যন্ত পুরোদমে পাঁচ দিন ধরে চলেছিল।

৬১. তবে কংগ্রেস কিংবা ব্রিটিশ শক্তি কেউ যোগেনকে দলিতদের প্রতিনিধি হিসেবে মানতে রাজি ছিল না। তাদের যুক্তি ছিল ১৯৪৬-এর নির্বাচনী ফল অনুযায়ী কংগ্রেসই বাংলায় তফসিলিদের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

৬২. *ফেডারেশন সভাপতির বিবৃতি* শিরোনামে এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।

৬৩. এই বিষয়ে আরও আলোচনা দেখা যেতে পারে, Dwaipayan Sen, *No matter how Jogendranath had to be defeated*', *Ibid*, p. 340. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0019464612455273, p.340.

৬৪. *স্মৃতিকথা*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ৭৮।

৬৫. জয়া চ্যাটার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮ ও ২৩১।

৬৬. এখানে মতুয়া নেতৃত্বের বংশলতিকাটি কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। হরিচাঁদ ঠাকুরের দুই পুত্রের একজন ছিলেন গুরু চাঁদ ও উমাচরণ। গুরু চাঁদের চার পুত্র ছিল। এর মধ্যে প্রথম পুত্র শশীভূষণের প্রথম পুত্র হলেন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। ভারতে বর্তমানে মতুয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের স্ত্রী 'বড়মা' বীণাপাণি দেবী। অন্যদিকে বাংলাদেশে মতুয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুরু চাঁদ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সুধন্য কুমারের নাতি হিমাংশুপতি।

৬৭. এ বিষয়ে যোগেন মণ্ডলের মনোভাবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 'সংযুক্তি: এক'-এ। যোগেন 'হরিজন আন্দোলন'কে গান্ধীর 'সংকীর্ণতা' ও 'অমহত্ত্বের পরিচয়' মনে করতেন।

৬৮. 'ফেডারেশনপন্থী' বলতে বোঝানো হতো যাঁরা তফসিলি ফেডারেশন তথা যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের।

৬৯. প্রমথ ঠাকুরের এরূপ আহ্বান কংগ্রেসের জন্য ভালো ফল বয়ে এনেছিল পরবর্তীকালে। অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ নির্বাচনে তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে কংগ্রেস ভালো করেছিল। বিস্তারিত দেখুন: মনোশান্ত বিশ্বাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৬। বস্তুত এরই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা হলো আজকের পশ্চিমবঙ্গের 'মতুয়া মহাসংঘ' নামের সংগঠন। স্থানীয় বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৭৪টিতে এই মতুয়াদের ফলাফল প্রভাবিত করার মতো সক্ষমতা রয়েছে বলে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা বলে থাকেন। মূলত এই 'মতুয়া মহাসংঘ' এবং গরিব মুসলমানদের সমর্থনই সেখানে ৩৫ বছরের বামফ্রন্ট শাসন অবসানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে সাহায্য করেছিল।

৭০. *সিলেট গণভোট*, সম্পাদনা : শাহীন আহমেদ, এসএম কমিউনিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫।

৭১. প্রসূন কান্তি-বরুণ রায়, 'মুসলিম লীগ সব শক্তি নিয়ে মাঠে নামে', *সিলেট গণভোট*, সম্পাদনা : শাহীন আহমেদ, এসএম কমিউনিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৬। সিলেটের গণভোটে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে, মোহাম্মদ তোয়াহা লিখেছেন,

'কমিউনিস্ট পার্টির সার্কুলার মারফত পার্টি কর্মীদের ওপর নির্দেশ আসল গণভোটে সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির বিরোধিতা করতে হবে। পার্টি তখনো পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়নি। কাজেই এখানকার কর্মীগণ পার্টির নির্দেশ মানতে বাধ্য। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া যা হওয়ার তাই হলো।...পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও গণভোটে মুসলিম লীগের জয় হলো। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।' [*স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭]

৭২. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, এ রকম দাবিও রয়েছে যে, যোগেন মণ্ডল আদৌ সিলেট গণভোটের প্রচারণায় অংশ নেননি। এ বিষয়ে যোগেন মণ্ডলের পুত্র জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল লিখেছেন, 'কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যোগেন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট যাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তার জন্য প্রচারকার্য চালিয়েছেন।...কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগেন্দ্রনাথ তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন।' *মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

এরূপ ভাষ্য সত্ত্বেও বর্তমান লেখায় গণভোটে অংশ নেওয়া ভাষ্যগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন, 'সিলেটে গণভোট ১৯৪৭' (শাহীন আহমেদ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত) শীর্ষক প্রকাশনায় পৃথক পৃথক লেখায় আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন, 'গণভোটের প্রচারণায় এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তফসিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।...তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে ছিল পেরেশানি।' (পৃ. ৮-৯) নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী লিখেছেন, 'ফুলতলা থেকে মৌলভীবাজার চা-শ্রমিকদের লংমার্চ পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়।...জিন্নাহ সাহেবের সহচর যোগেন্দ্র মণ্ডল এসে তফসিলি সমাজের যথেষ্ট ভোট পাকিস্তানের অনুকূলে কাস্ট করান।' (পৃ. ২৬)। ইনাম আহমদ চৌধুরী বলছেন, 'যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রচারণা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বহু ভোট তিনি জোগাড় করেন। বড় সংখ্যক হিন্দু ভোট না পেলে সিলেটে পাকিস্তানপন্থীদের সংখ্যাধিক্য হওয়া কষ্টকর হয়ে যেতে পারত। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বসন্ত কুমার দাস *যুগশক্তি* পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন যোগেন্দ্র মণ্ডলকে সিলেটে প্রেরণ জিন্নাহর একটা বিশেষ চালাকি।' (পৃ. ৪১)

সরাসরি ভোটের কাজে অংশ নেওয়া সিলেট অঞ্চলের উপরিউক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসব কথা প্রমাণ করে যে, যোগেন মণ্ডল গণভোটের প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন।

৭৩. ভোটের ফলাফল শেষে র‍্যাডক্লিফ সীমানা কমিশন ১৮ আগস্টে তাদের মতামত প্রদান করে। মুসলমানপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা এলাকাকে বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচাতে করিমগঞ্জ-বদরপুর-পাথারকান্দি-হাইলাকান্দি ইত্যাদি এলাকা আসামভুক্ত করা হয়। ফলে আসাম পায় বদরপুর জংশন, করিমগঞ্জ জংশন এবং বারইগ্রাম জংশন। সিলেট পায় অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও বড়লেখা। মুসলিম লীগ শুরুতে সিলেট ছাড়াও কাছাড় জেলাকেও পাকিস্তানভুক্ত করার দাবি তুলেছিল। কংগ্রেস কর্তৃক প্রবলভাবে সেই দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার পর কেবল সিলেটে গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

৭৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ. ৫৯-৬০।

৭৫. পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে যিনি দেশটির অর্থমন্ত্রী এবং একই বছর কয়েক মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীও হন।

৭৬. Akhtar Balouch, *Jogendra Nath Mandal: Chosen by Jinnah, banished by bureaucracy,* https://www.dawn.com/news/1217465 (November 04, 2015)

৭৭. A K Biswas, *A memorable chapter neglected in history: Ambedkar's Odyssey to the Constituent Assembly of India through Bengal* http://www.mainstreamweekly.net/article6905.html (26 Dec. 2016)

৭৮. যদিও এ সময় কংগ্রেসের সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'দরজা তো বটেই, এমনকি সংবিধান সভার জানালাগুলোও বন্ধ করে রাখা হবে আম্বেদকরের জন্য; দেখা যাক সে কীভাবে সংবিধান সভায় আসে।' কিন্তু দেখা গেছে, আম্বেদকরকে সমর্থনকারী সাতজনের মধ্যে দুজন ছিলেন কংগ্রেসদলীয় নমশূদ্র এম.এল.এ.।

৭৯. 'দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্রের বিবৃতি' শিরোনামের এক পুস্তিকার মাধ্যমে যোগেনকে ভোট দেওয়ার আহ্বান প্রচারিত হয়। নির্বাচনী আইনের এক সংস্কারের মধ্য দিয়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চারজন তফসিলি প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেবারই প্রথম। ফজলুল হকের সরকার এই সংস্কার এনেছিল। তিন ওয়ার্ডে ভোটাররা দুজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকারী ছিলেন। একজন বর্ণহিন্দু এবং একজন তফসিলি। বর্ণহিন্দুদের জন্য সুভাষ চন্দ্র বসুর সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন সুধীর চন্দ্র রায় চৌধুরী।

যোগেনের এমএলএ হওয়া এবং করপোরেশনের কাউন্সিলর হওয়ার মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় তিন বছর। ১৯৪০-এর মার্চের ওই নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিন্দু মহাসভার রাধানাথ দাস। তবে যোগেনকে কংগ্রেসের 'গান্ধীপন্থী' একাংশের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছিল। তাঁকে প্রার্থী করে কংগ্রেসের সুভাষপন্থী অপর অংশ। ইতিহাসের এই সময়ে কংগ্রেসে নেতৃত্ব পর্যায়ে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ বিবাদ চলছিল। এই বিবাদের একদিকে ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং অপর দিকে ছিলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। কংগ্রেসের ওই দুটি ধারাকে তখন লোকসমাজে বলা হচ্ছিল, 'স্বদেশি-কংগ্রেস' এবং 'গান্ধী-কংগ্রেস।' এই দুই পক্ষ যেসব স্থানে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তার একটি ছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন।

৮০. Sekhar Bandyopadhyay and Ansua Basu Ray Chaudhury, *Partition in Bengal, Re-visiting the Caste Question, 1946-47*, Sage, 2017, p.242.

৮১. জগজীবন রাম বিহারের তফসিলি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় প্রতিনিধি হলেও ১৯৪৭-
এর পূর্বাপর তিনি বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনীতি করেছেন এবং
কংগ্রেসে তাঁকে ব্যবহার করেছে প্রথমত আম্বেদকরকে মোকাবিলার জন্য এবং
পরে যোগেন মণ্ডলের বিকল্প হিসেবে। জগজীবন রামের সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া
ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ'কে কংগ্রেস তাদের মিত্র সংগঠন মনে করত। যোগেন
মণ্ডলের মতোই ১৯৩৭-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয় রাজনীতিতে
অভিষেক। জনসমাজে তিনি 'বাপুজি' নামে পরিচিত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর
সময়ে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক বিচ্ছেদ ঘটে।

৮২. এইরূপ তথ্য-উপাত্তের পাশাপাশি দ্বৈপায়ন সেনের গবেষণাসূত্রে আরও দেখা
যায়, ১৯৪৬-এর নির্বাচনে সব প্রদেশেই একই ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন
প্রদেশের প্রথম দফা ভোটে অংশ নেওয়া ৫০৫ জন তফসিলি প্রার্থীর মধ্যে
কংগ্রেসের ছিল ১৫৩ জন। চূড়ান্ত ভোটকালে ১৫১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের
১৫৩ জনের ১৪২ জনই জেতেন। অর্থাৎ পুনা চুক্তি ভোটে কংগ্রেসকে চরম
সুবিধা করে দিয়েছিল। সমগ্র ভারতে এই নির্বাচনে মণ্ডলের দল তফসিলি
ফেডারেশনের মাত্র দুজন প্রার্থী জিতেছিল, যা রাজনৈতিক দর-কষাকষিতে
তাদের অবস্থান চিরতরে দুর্বল করে দেয়। বিস্তারিত দেখুন, Dwaipayan Sen,
*No matter how Jogendranath had to be defeated*', *Ibid*, p. 328.

৮৩. এ পর্যায়ে যেটা দেখা জরুরি, পুনা চুক্তির মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তফসিলি
জনপ্রতিনিধিত্বের প্রায় পুরো পরিসরটি দখলে নিলেও ওই প্রতিনিধিদের তারা
কিন্তু দলের নেতৃত্বে ঠাঁই দেয়নি। দ্বৈপায়ন সেন দেখাচ্ছেন, ১৯৪৬ সালের
নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে তফসিলি যারা জিতেছিল বাংলায় তাদের তফসিলি

সহ প্রার্থীসহ) তাদের কাউকে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নেওয়া হয়নি। এমনকি একজন তফসিলি নেতৃবর্গ কাউকে বাংলার কোনো জেলার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকও করা হয়নি দেখুন, *Ibid*, p. 330.)।

এরূপ অভিজ্ঞতা থেকে তফসিলিদের প্রতি কংগ্রেসের গভীরে জারি থাকা বর্ণহিন্দু হেজিমনির উপস্থিতি খুব সহজে শনাক্ত করা যায় এবং একই সাথে তা পরোক্ষে তফসিলি ফেডারেশনের সেই রাজনৈতিক বক্তব্যকেই সমর্থন করছিল যে নিপীড়িত বর্গ হিসেবে দলিত-তফসিলিদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা প্রয়োজন। উপরন্তু কংগ্রেসকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের উপরিউক্ত মনোভাবই বাংলার তফসিলিদের প্রতিনিয়ত মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটে প্রলুব্ধ করছিল, বিশেষত যখন যোগেন মণ্ডলের মতো নেতাকে অন্তর্বর্তী সরকার এবং পাকিস্তান সরকারে সর্বোচ্চ স্তরে মনোনীত করতে দ্বিধান্বিত করছিল মুসলিম লীগ।

৮৪. ভ. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭*। https://bangalnama.wordpress.com/2009/08/31/annayan-bivajan-jati-namasudra-andolon

৮৫. ১৯৪৭-এর ৪ এপ্রিল কলকাতায় বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি 'বাংলা' ভেঙে দুটি প্রদেশ গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ এপ্রিল যোগেন মণ্ডল (তখন তিনি নেহরুর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী) সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ' কোনো সমাধান নয়। বরং স্বাধীন সংযুক্ত বাংলার জন্য চেষ্টা করা হবে। এর এক সপ্তাহের মধ্যে ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন সংযুক্ত বাংলা'র পরিকল্পনা পেশ করেন। শরৎ বসু সেটা সমর্থন করেন। এসব উদ্যোগ ব্যর্থ হলে যোগেন মণ্ডল ৫ আগস্ট করাচি চলে যান।

৮৬. জয়া চ্যাটার্জি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।

৮৭. *Bengal Legislative Assembly, Proceedings*, Alipore: Bengal Government Press, 5 August 1937, p. 209. দ্বৈপায়ন সেনের গবেষণা থেকে উদ্ধৃত। ১৯৩৭ পরবর্তী প্রাদেশিক পরিষদে যোগেন মণ্ডলের প্রাথমিক কিছু প্রশ্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনিও শুরুতে বেঙ্গল টেনান্সি (সংশোধন) বিলে কিছু সংস্কার প্রস্তাব এনেছিলেন। একই আইনসভায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি বিলের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে গোপালগঞ্জের তফসিলি নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে দাবি উত্থাপন করতে দেখা যায়। একই পরিষদে যোগেন মণ্ডল চাষিদের স্বার্থে 'Jute Regulation Act'-এর সংস্কার চাইছিলেন। যে আইন পাটের আবাদের পরিমাণ নির্ধারিত করত—অথচ পাটের দাম নির্ধারণের সুযোগ করে দিয়েছিল পাটকল মালিকদের

হাতে। দেখা যাচ্ছে, কৃষি ও ভূমি সংস্কার তখন দলিত-নমশূদ্রদের অন্যতম ভাবনার বিষয় ছিল।

৮৮. Dwaipayan Sen, *Representation, Education and Agrarian Reform, Jogen Mandal and the nature of Scheduled Cast politics, 1937-1943*, p. 37. https://www.academia.edu/6258503/Representation_Education_and_Agrarian_Reform_Jogendranath_Mandal_and_the_nature_of_Scheduled_Caste_politics_1937_1943

৮৯. Dwaipayan Sen, *Representation, Education and Agrarian Reform Jogen Mandal and the nature of Scheduled Cast politics, 1937-1943*, p. 27, 30. https://www.academia.edu/6258503/Representation_Education_and_Agrarian_Reform_Jogendranath_Mandal_and_the_nature_of_Scheduled_Caste_politics_1937_1943

৯০. এই সরকারের সদস্যসংখ্যা স্থির করা হয়েছিল ১৪ জন। মুসলিম লীগের জন্য খালি রাখা ছিল মাত্র দুটি পদ। তবে তারা পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠায়। ভাইসরয়ের নেতৃত্বেই এই সরকারের বৈঠক বসত। মাত্র ৯-১০ মাসের আয়ুষ্কালে দুজন ভাইসরয় পেয়েছিল এই সরকার। প্রথমজন ছিলেন আর্চিবাল্ড ওয়াভেল, সর্বশেষজন ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এই সরকারের সাংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল। প্রধান দুই দলের একটা সম্মিলিত মন্ত্রিসভা হিসেবে এই সরকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সামাল দিতে অক্ষম ছিল। ব্রিটিশরাও যেহেতু তখনো গুরুত্বপূর্ণ একটি পক্ষ ছিল, সে কারণে সরকারের ভেতরে কাজ করত ত্রিমুখী টানাপোড়েন। এই অন্তর্বর্তী সরকারের চার মাসে ভারতে দাঙ্গায় যত মানুষ মারা যায়, পূর্ববর্তী কয়েক দশকেও তা ঘটেনি। গঠন সম্পর্কিত ব্যাপক বাদ-প্রতিবাদের পর ১৯৪৬-এর ৯ ডিসেম্বর এই সরকারের প্রথম বৈঠক হয়।

৯১. লিয়াকত আলী খান (অর্থ মন্ত্রণালয়), ইব্রাহিম ইসমাইল চুন্দ্রিগড় (বাণিজ্য), আবদুর রব নিশতার (ডাক ও বিমান), গজনফর আলী খান (স্বাস্থ্য) এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন)। এই নিয়োগের চূড়ান্ত হকদার ছিলেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। তিনিই নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন, যা ছিল নিম্নরূপ:

GEORGE R.I.

George The Sixth by the grace a God of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas King defender of the Faith Emperor of India.

To our Trusty and well beloved the honourable Jogendra Nath Mondal.

GREETING

(i) We do by this our warrant under our Sign Manual Appoint you the said Jogendra Nath Mondal to be during our pleasure a Member of the Executive council of our Governor General of India.

(ii) And do hereby appoint that so

soon as you Shall have entired upon the duties of your office this our Warrant shall have effect.

GIVEN at our Court at St. James's this Twenty first day of October 1946 and in the tenth year of our Reign.

দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে'জ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০৫৭।।

১২. এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন, *পাকিস্তান কি সিয়াসি তারিখ* (উর্দু), জাহিদ চৌধুরী ও অন্যান্য, ইদারা মুতালা-ই-তারিখ, খণ্ড-২, পৃ. ৪৭।

১৩. Dwaipayan Sen, *No matter how Jogendranath had to be defeated, Ibid, p. 341.*

১৪. *Ibid,* p. 342. যোগেন মণ্ডল তাঁর তফসিলি পরিচয় ও স্বার্থচিন্তায় এত আপসহীন ছিলেন যে, এ নিয়ে একটা আখ্যান তুলে ধরেছেন দ্বৈপায়ন সেন উল্লিখিত গবেষণায়। সেখানে দেখা যায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বিতীয় প্রধান মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে যখন যোগেন মণ্ডলের কয়েকটি বৈঠক হয়, তখন একদিন মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করেন, 'মি. মণ্ডল আপনি সব সময় তফসিলিদের প্রসঙ্গে কথা বলছেন। অন্যদের প্রসঙ্গে বলছেন না।' যোগেন তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি বলছি, কারণ গান্ধী ও নেহরু কখনোই আপনাকে তফসিলিদের বিষয়ে বলবে না। তারা যদি এদের কথা বলত তাহলে আমি আপনাকে কখনোই বলতাম না।'

১৫. জিন্নাহ পাকিস্তানের করাচির উদ্দেশে দিল্লি ছাড়েন ৭ আগস্ট, ১৯৪৭। এটাই ছিল ভারত থেকে তাঁর শেষ যাত্রা। এর পরের দিনই ভারতে তখনকার সংবিধান সভা'য় প্যাটেল বলেছিলেন, 'ভারতের শরীর থেকে বিষ দূর হয়েছে।' (যশোবন্ত সিংহ, *জিন্নাহ: ভারত-দেশভাগ-স্বাধীনতা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪০৬)

১৬. ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে যাদের নির্বাচনী এলাকা নব-সৃষ্ট পাকিস্তানের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে পড়েছিল (সিন্ধু, পূর্ব বাংলা, বালুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) তাদেরই নিয়েই সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের সংবিধান সভা গঠন করা হয়েছিল। প্রতি দশ লাখ জনগণের জন্য একজন প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানে মোট ৬৯ জনকে নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে ৪৪ জন

ছিল পূর্ব বাংলার। পরবর্তীকালে পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহ পাকিস্তানে একীভূত হওয়ায় এবং ভারত থেকে বিপুলসংখ্যক মোহাজের পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে আশ্রয় নেওয়ায় এ সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৯ করা হয়। সংবিধান সভায় মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয় প্রধান দল ছিল কংগ্রেস। এই দলের প্রতিনিধি ছিলেন ১১ জন, যাঁরা কার্যত ১৯৪৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দেশভাগের পর পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলেই থেকে যান। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর সংবিধান প্রণয়ন না করেই এই সংবিধান সভা অবলুপ্ত হয়ে যায়, তখনকার গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদের একক সিদ্ধান্তে।

৯৭. জিন্নাহ সম্পর্কে যোগেন মণ্ডলের এরূপ ধারণার গভীর ভিত্তি ছিল। ভারতবর্ষে 'মুসলমানরা একটা স্বতন্ত্র জাতি' এই ধারণার যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর রাজনৈতিক জনক অবশ্যই জিন্নাহ। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি বা হিন্দুদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বিরাগ না থাকার কথা তাঁর শত্রুরাও বলেন। তাঁর যাবতীয় বিরূপতা ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি। যাঁকে তিনি মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন এবং এই লড়াইয়ে মুসলমানরা ছিল জিন্নাহর কাছে একটা 'নির্বাচকমণ্ডলী' মাত্র। যে মুসলমানদের মাঝে ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চনার একটা ঐতিহাসিক বোধ; অন্তত বাংলায়। যোগেনের সঙ্গে জিন্নাহর মনস্তাত্ত্বিক সহমর্মিতার এটাই ছিল সমাজতাত্ত্বিক পাটাতন।

৯৮. এই বিবৃতি প্রকাশিত হয় ওই বছর জিন্নাহর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। বিস্তারিত দেখুন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ জানুয়ারি ১৯৪৮।

৯৯. একই বছরের শুরুতেই মারা যান গান্ধীও। এদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় এক বিশিষ্ট ধারার রাজনীতির অবসান ঘটে।

১০০. যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগপত্রের ইংরেজি থেকে অনুবাদ। বিস্তারিত দেখুন, যোগেন মণ্ডল বিষয়ে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের সংযুক্তি: এক।

১০১. কার্তিক ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

১০২. আপাতদৃষ্টিতে অতি নিরীহ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম লক্ষ্য নিয়ে সম্পাদিত এই চুক্তিরও প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন ভারতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চুক্তির প্রতিবাদে তিনি নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করার পর তিনি জনসংঘ নামে চরম ডানপন্থী একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন, যার উত্তরসূরি হলো আজকের বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদের এরূপ বিরোধিতা ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসের এক করুণ স্ববিরোধী রাজনীতির স্মারক। কারণ, যেসব রাজনীতিবিদ ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা ভাগের পক্ষে সর্বোচ্চ মাত্রায় সোচ্চার ছিলেন তাঁদেরই একজন শ্যামাপ্রসাদ। আবার

*Bengal after Partion*, 2014)। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ২০ লাখ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। কমিউনিস্ট পার্টির নামে খুলনা অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিপীড়নমূলক কিছু ভূমিকা এরূপ পরিস্থিতিতে ইন্ধন জোগায়। আবার এরূপ ঘটনাকে কলকাতার প্রচারমাধ্যম সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে এমনভাবে প্রচার করে যে, সেখানেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যায়, যার প্রধান শিকার হন এখানকার মুসলমানরা। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব বাংলায় আবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই দাঙ্গা-পুনর্দাঙ্গার এক দুষ্টচক্রে প্রবেশ করে উভয় বাংলা। এ পর্যায়ে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন মূলত গরিব দলিত ও মুসলমানরাই। ফলে ১৯৫০ থেকেই মূলত দলিত ও মুসলমানদের ঐতিহাসিক ঐক্যের পুরাতন প্যাটার্নটি ভেঙে পড়ে।

১০৭. *In Search of Space: The Scheduled Cast Movement in West Bengal after Partion, 2014*, p.4. http://www.mcrg.ac.in/PP59.pdf

১০৮. কার্তিক ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১০৯. এর মধ্যে তফসিলিদের জন্য ছিল ৩৭টি।

১১০. কার্তিক ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৮।

১১১. বিস্তারিত দেখুন, মৈনাক বিশ্বাস, বাংলা থেকে আম্বেদকরকে জিতিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ, https://www.anandabazar.com/supplementary/rabibashoriyo/he-had-always-fought-for-the-lower-cast-people-1.849720?ref =archive-new-stry (২৯ জানুয়ারি, ২০১৮)

১১২. Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *In Search of Space: The Scheduled Cast Movement in west Bengal after Partion, 2014*, *Ibid*, p.11.

১১৩. Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *Ibid*, p.10.

১১৪. Copy of I.B.Officer's report dated 15/3/58, GB, IB Records; F.No. 1483/32, WBSA.

১১৫. এই পার্টি গড়ে তুলেছিলেন আম্বেদকর ১৯৩৬-এর ১৫ আগস্ট। মূলত জাতপাত ও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিল এই দল। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪টি আসন পেয়েছিল। পরবর্তীকালে এই দল বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে।

১১৬. মনোশান্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

'৪৭ পরবর্তী বাংলা ভাগের কারণেই বিভক্ত উভয় অংশে দাঙ্গার উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটেছিল। এই সেই দাঙ্গার কুফল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যখন নেহরু ও লিয়াকত আলী চুক্তি করছিলেন, তখন আবার শ্যামাপ্রসাদই তার বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি, যোগেন মণ্ডল প্রথম থেকে বাংলা ভাগের বিরোধী ছিলেন। বিভক্তির পর তিনি পূর্ব বাংলাজুড়ে ঘুরে ঘুরে দাঙ্গা থেকে দলিতদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করছিলেন এবং দিল্লি চুক্তিরও অন্যতম আশাবাদী সমর্থক ছিলেন তিনি। অথচ পরবর্তীকালে প্রচারযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, যোগেন মণ্ডল চিহ্নিত হন হিন্দুস্বার্থবিরোধী হিসেবে।

১০৩. বিপুল মানুষের শরণার্থী হওয়ার আরও কিছু কারণ ঘটেছিল তখন, যা কার্যত প্রচলিত রাজনৈতিক সাহিত্যে কমই আলোচিত হয়। ১৯৪৭-এর সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বছর দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে অর্থনৈতিক সংকটও ছিল প্রবল। পাটের দাম পড়ে গিয়েছিল। দ্রুত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিপুলসংখ্যায় চলে যাওয়ায় দরিদ্র দলিতদের কাজ দেওয়ার মতো পরিবার ও উদ্যোক্তার সংকট দেখা দেয়। ফলে শ্রমিক আধিক্য তৈরি হয়। আবার মুসলমান ভূস্বামীরা কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমে মুসলমান দিনমজুরদের অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন। দলিত-মুসলমান মৈত্রীর পরিবেশ ভেঙে পড়ামাত্র ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল এবং নারীর নিরাপত্তাও একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল, যা নমশূদ্র পরিবারগুলোকে দেশান্তর হতে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। নিরাপত্তাহীনতার একটি ঘটনাই অনেক গুজবের জন্ম দিচ্ছিল।

১০৪. কার্তিক ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

১০৫. এরূপ সংখ্যালঘুর সংখ্যা অন্তত ২০ শতাংশের বেশি ছিল, যার মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১৬ শতাংশ। তবে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে। বর্তমানে পাকিস্তানে 'সংখ্যালঘু'রা সংখ্যায় কমবেশি ৩ শতাংশ মাত্র। হিন্দুদের সংখ্যা সেখানে ১.৫ থেকে ২ শতাংশের মতো, যা ১৯৪৭-এর সময়েও পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে অনুরূপই ছিল।

১০৬. সম্ভবত এই সময়ই প্রথম ব্যাপক হারে নিম্নবর্ণের দলিত-নমশূদ্ররা পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার কথা ভাবতে শুরু করেন। এটাকে বলা যায়, পাকিস্তান থেকে ভারতমুখী হিন্দু শরণার্থীদের দ্বিতীয় তরঙ্গ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত যাঁরা সীমান্ত পেরিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুখ্যত উচ্চবর্ণের হিন্দু। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির পরই কেবল তফসিলিরাও জন্মভূমি ছাড়ার কথা ভাবতে বাধ্য হন। প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান ব্যবহার করে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন (*In Search of Space: The Scheduled Cast Movement in west*

১১৭. যোগেন মণ্ডলের মৃত্যু ছিল বাংলার দলিত তফসিলি সম্প্রদায়ের সাংগঠনিকভাবে সবচেয়ে দক্ষ এক রাজনীতিবিদের হারিয়ে যাওয়া। তাঁর মৃত্যুর পর প্রমথরঞ্জনের নেতৃত্বে তফসিলিদের অপর ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল পূর্বে উল্লিখিত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের 'ঠাকুরনগর'কে কেন্দ্র করে। তবে তাঁর সক্রিয়তার পদ্ধতি ছিল যোগেনের চেয়ে ভিন্ন। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে তিনি কলকাতা থেকে প্রায় ৬৩ কিলোমিটার দূরে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপুর ও গোবরডাঙার মাঝামাঝি অঞ্চলে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে একটি হাউজিংধর্মী প্রকল্প শুরু করেন এবং বেসরকারি এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এলাকাটিতে পূর্ববঙ্গীয় দলিতদের পুনর্বাসন শুরু হয়। পরবর্তীকালে এখানে জমির চাহিদা বাড়ে এবং এক দশকের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ পুনর্বাসিত হয়। সরকারও এতে সহায়তা দেয়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের নমশূদ্রদের অর্ধেকই চব্বিশ পরগনা ও নদীয়াকে কেন্দ্র করেই বাস করছে। তবে আগেই যেমনটি বলা হয়েছে প্রমথরঞ্জন এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়াটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অনেকটা একজন আধ্যাত্মিক নেতা ('মহাসংঘাধিপতি')-এর আদলে। 'মতুয়া মহাসংঘ' নামে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়েছিল বৃহত্তর ফরিদপুরে তারই ধারাবাহিকতায় চব্বিশ পরগনার 'ঠাকুরনগর' বিকশিত হয়। অর্থাৎ বাংলা ভাগ নমশূদ্র মতুয়া আন্দোলনের কেন্দ্রকে ফরিদপুরের ওড়াকান্দি ও পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরের মধ্যে বিভক্ত করে। ঠাকুরনগরের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৬০-এর পর পি আর ঠাকুর সন্নিহিত অঞ্চলে নমশূদ্রদের নেতারূপে আবির্ভূত হন। বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পের অধিকারভিত্তিক সভাগুলোতে যেতেন তিনি। পাশাপাশি কংগ্রেসের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে হরিণঘাটা থেকে বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে অপর একটি সংরক্ষিত আসন থেকে পুনরায় বিধানসভায় সদস্য হন এবং পরের বছরই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। তবে নমশূদ্রদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুদিন পরই তিনি মন্ত্রিসভা ছাড়েন এবং কংগ্রেসও ত্যাগ করেন। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভা নির্বাচনে তিনি নবদ্বীপ আসন (তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত) থেকে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে পরের নির্বাচনে তিনি আর জিততে পারেননি। ইতিমধ্যে যোগেনের মতোই তিনিও সরকার কর্তৃক এক দফা গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৭৭-এর পর থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। এ সময় তিনি মতুয়া মহাসংঘকে মূলত ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। ১৯৯০-এ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কপিল কৃষ্ণ মতুয়া সংঘের

কার্যক্রমকে তাদের অন্যতম সম্প্রসারিত করেন। ২০০৮ নাগাদ এই সংঘের ভারতজুড়ে প্রায় ৬ হাজার ৭৫৫টি শাখার তথ্য পাওয়া যায় (Sekhar Bandyopadhyay, *Ibid*, p.15) এবং এসব শাখার অধীনে প্রায় পাঁচ কোটি মতুয়া রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

সমাজের ধারাবাহিকতায়, বিশেষ করে ২০০৯ থেকে দলিত নমশূদ্রদের এই ধারাটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আবার রাজনৈতিকভাবে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের সাব্যস্ত করেছে। তবে অন্যান্য দলও মতুয়াদের সমর্থন পেতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পর্যায়ে যেটা লক্ষ করা যায়, 'শ্রেণি' ধারণাকে ব্যবহার করে গড়ে ওঠা বামফ্রন্টের সমাবেশশক্তির বিপরীতে বর্ণ শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মতুয়া সমাবেশশক্তি নির্বাচনী রাজনীতিতে অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে ধারণা মেলে, যোগেন ছয়-সাত দশক পূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদকে মোকাবিলায় যে বহুজন রাজনীতির তাগিদ দিতেন পশ্চিমবঙ্গে আবার তা প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেল এবং ভারতজুড়েই এই 'মডেল'-এর ওপর দাঁড়িয়ে 'দলিত-মুসলমান ঐক্যের' রাজনীতি বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে।

১১৮. মনোশান্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪।

১১৯. ড. নজরুল ইসলাম, মুসলমানদের করণীয়, মিত্র অ্যান্ড ঘোষ, কলকাতা, প্রকাশকাল : বাংলা ১৪১৯, পৃ. ২০।

১২০. এই দিকে থাকার বড় প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ২০০৩ সালে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা দেয়, উঁচু জাতির ছেলেমেয়েরা যদি নীচু জাতির ছেলেমেয়েদের বিয়ে করে তাহলে নির্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া হবে। মনোশান্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪।

১২১. এক হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০০টিতেই দলিত-মুসলমান-খ্রিষ্টানদের যৌথ ভোট বর্ণহিন্দুদের চেয়ে বেশি। একে অভিহিত করা হচ্ছে 'বহুজন' রাজনীতির নির্বাচনী সম্ভাবনার দিক। তবে 'বহুজনবাদ' নিঃসন্দেহে কেবল নির্বাচন ও ক্ষমতা দখলের কথা বলে না, বরং নিম্নবর্গের আরও বৃহত্তর মুক্তির কথা বলে।

১২২. কেবল দলিত-মুসলমানরাই না, রাজবংশীরাও 'কামতাপুর' নামক রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজেদের সমাবেশশক্তিকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছে। মূলত কোচবিহার ও জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে রাজবংশীদের রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ চেষ্টাকেই 'কামতাপুরী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। বিগত দশকে অত্যন্ত সক্রিয়তা থাকলেও ব্যাপক

রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক দমন-পীড়নের মুখে বর্তমানে এই আন্দোলনের মূল সংগঠন 'কেএলও' অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিগত বামফ্রন্ট সরকার এদের দমনে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ব্যাপক দমনাভিযান চালিয়েছিল একদা। অন্তত কয়েক শত কেএলও কর্মীকে হত্যা করা হয় তখন। পাশাপাশি দিল্লির চাপে ভুটান সরকারও ২০০৩-এর ডিসেম্বরে তাদের অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা কেএলও সংগঠকদের ধরে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে। ভারতীয় সহায়তায় পরিচালিত এই অভিযানের প্রতীকী নাম ছিল Operation Flushout।

উল্লেখ্য, কোচবিহার ভারতে যুক্ত করা হয় ১৯৪৮-এর ২০ আগস্ট। কোচবিহারের লোকসংখ্যার ৬৯ শতাংশ ছিল রাজবংশী। এ সময় কোচবিহারের রাজা ছিলেন জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ। ১৯৭০-এর ১১ এপ্রিল তিনি কলকাতায় মারা যান। কেএলও মনে করে, কোচবিহারের ভারতভুক্তি স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হয়নি। বস্তুত রাজবংশীদের জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ১৯৪৫-এর সময়ে রংপুরে এক সাহিত্য সম্মেলনে এ অঞ্চলে বাংলার পাশাপাশি রাজবংশী ভাষারও সাংবিধানিক মর্যাদা দাবি করেছিলেন।

১২৩. এটা মূল পদত্যাগপত্রের অনুবাদ। মূলত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগকালীন অনুভূতি বুঝতে এখানে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদটি তুলে ধরা হচ্ছে। আগ্রহীদের পদত্যাগপত্রটির ইংরেজি পাঠ দেখতে পারেন এই লিংকে: https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.indian/MbSIAi_2Ucc